বঙ্গ কমলবার্তা

সংখ্যা-ডিসেম্বর। সাল-২০২৫

ভারত-রাশিয়া 'অটল' বন্ধুত্ব

৫০০ বছরের প্রতীক্ষার অবসান রাম মন্দিরে উঠল ধর্মধ্বজা

নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক জোটের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

২০২৫ ব্লাইন্ড টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় ব্লাইন্ড মহিলা ক্রিকেট দলের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

অযোধ্যার শ্রীরাম জন্মভূমি মন্দিরে পবিত্র ধ্বজারোহণ মহোৎসবে মন্দিরের শিখরে পবিত্র ধর্মধ্বজা উত্তোলনের মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

জোহানেসবার্গে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন মঞ্চে বিশ্ব নেতৃত্বের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।
বিশ্বের কাছে তাঁর বার্তা ছিল এক শক্তিশালী ভারত এবং এক শক্তিশালী বৈশ্বিক ভবিষ্যতের অংশীদার।

বঙ্গ
কমলবার্তা
ডিসেম্বর সংখ্যা। ২০২৫

রামমন্দির পুনরুদ্ধারঃ ভারত আত্মার ঘরে ফেরা ৪
সৌভিক দত্ত

ব্রিগেডে গীতাপাঠ হিন্দুর রণহুঙ্কার ৮
জয়ন্ত গুহ

এসআইআর-এর সাঁড়াশি চাপে তৃণমূলের দুয়ারে বিভীষিকা ১১
দিব্যেন্দু দালাল

হুমায়ুনের বাবরি তৃনমূলেরই প্রডাক্ট ১৪
স্বাতী সেনাপতি

বাস্তুচ্যুত হিন্দু শরণার্থীদের প্রতি ঐতিহাসিক অবিচার কংগ্রেসের: সংশোধন করেছে নরেন্দ্র মোদী সরকার ১৬
দ্রুত বদলে যাওয়া জনবিন্যাস নিয়ে শ্রী অমিত শাহের বক্তৃতার প্রথম কিস্তি

ছবিতে খবর ১৮

কবি-প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী ২৪
বিনয়ভূষণ দাশ

ভারত–রাশিয়া সম্পর্কের নবযাত্রা: বাজপেয়ীর কৌশলগত বাস্তববাদ থেকে মোদীর বহুমুখী অংশীদারিত্ব ২৭
অনিকেত মহাপাত্র

আদিনা মসজিদ নয় ওটা আদিনাথ মন্দির ৩১
অভিরূপ ঘোষ

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, সৌভিক দত্ত, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়

ফাইনাল দেরি আছে। তার আগেই সেমিফাইনালে, কেরালার রাজধানী তিরুবনন্তপুরম বামেদের থেকে ছিনিয়ে নিল বিজেপি।

পুরনিগমের ভোটে তিরুবনন্তপুরম কর্পোরেশনে কার্যত সিপিএম-কংগ্রেসকে উড়িয়ে বিজেপির এই জয়ে পরিষ্কার কেরালা আর বিজেপি-র জন্য ধরাছোঁয়ার বাইরে নয় এবং ২০২৬-এর নির্বাচনে কেরালায় ক্ষমতা হারাতে চলেছে বামপন্থীরা।

শুধু তিরুবনন্তপুরম নয়, ২০২০ সালের ভোটে জেতা পালাক্কড় পুরসভাও ধরে রেখেছে বিজেপি। পাশাপাশি ত্রিপুনিথুরা পুরসভাও এবার বিজেপির দখলে।

থোদুপুঝা এবং কানহানগড়ের মতো পুরসভাগুলিতে প্রতিপক্ষের ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে গেরুয়া শিবির।
কেরালায় যখন হুড়মুড়িয়ে ভাঙছে বাম দুর্গ তখন পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'র‍্যাডিক্যাল বাম' তৃণমূল কংগ্রেস চোখে আঙ্গুল দিয়ে প্রমাণ করল তাঁদের নেতা-মন্ত্রী-পুলিশ-প্রশাসন সরকার তো দূরের কথা একটা বড় ইভেন্ট সামলাতেও ব্যর্থ। ব্যর্থ বলা ভুল। এক্কেবারে অপদার্থ।

পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে মানুষ দেখতে গিয়েছিল লিওনেল মেসিকে। কিন্তু তাঁকে ঘিরে রইল অরুপ-রতন! তাঁকে ঘিরে রইল শুভ-শ্রী! চূড়ান্ত অব্যবস্থায় যুবভারতী যখন ক্ষোভের আগুনে জ্বলছে তখন তৃণমূলের দলদাস পুলিশ ব্যস্ত হ্যাংলা নেতামন্ত্রীদের নিয়ে!

আর শাহরুখতো মাঠেই এলেন না। বিদায় নিলেন হোটেল থেকেই। মাঠে আসার পথে মাঝপথ থেকেই বিদায় নিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। বাধ্য হলেন ক্ষমা চাইতে। তাঁর অযথা অহঙ্কার এবং লাগামছাড়া সংবিধান বিরোধী মন্তব্যে আগেই গোটা দেশের কাছে মুখ পুড়েছিল বাংলা ও বাঙালীর। এবার বিশ্বমঞ্চে মুখ পুড়ল বাংলার।

কে নেবে দায়? শুধু ক্ষমা চেয়ে কি দায় এড়ানো যাবে!

শুধু একবার তো নয়, বারবার ঘটছে। সন্দেশখালি থেকে আরজিকর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।
অপদার্থ পুলিশ প্রশাসন আছে কি জন্য? দায় অস্বীকার করতে পারে পুলিশমন্ত্রী?

কেরালার মতই ইঙ্গিত খুব পরিষ্কার। শেষের দিকে এমনটাই হয়।

২০২৬-এর নির্বাচন-তৃণমূলের বিসর্জন।

রাম মন্দির পুনরুদ্ধার
ভারত আত্মার ঘরে ফেরা

সৌভিক দত্ত

৬ ডিসেম্বর চলে গেল। আমাদের শৌর্য দিবস। ভারতের বাস্তিল পতনের দিন। সারা পৃথিবীকে দেখিয়ে দেওয়ার দিন যে, শুধু ইহুদিরা পারে না, বা শুধু স্প্যানিশ আর ফরাসিরা পারেনা, ভারতীয়রাও পারে, আমরাও পারি। তবে সহজে আসেনি এই সাফল্য। দীর্ঘ ৫০০টা বছর লড়াই করার পর এসেছে। সামরিক-বেসামরিক-আইনী অসংখ্য লড়াই লড়তে হয়েছে আমাদের। তারপরে গিয়ে আমরা বিদেশি লুটেরাদের থেকে পুনরুদ্ধার করতে পেরেছি আমাদের ভারতাত্মার জন্মস্থান।

সাল তখন ১৫২৮। সুদূর মধ্য এশিয়ার ফরগানা থেকে আসা বিদেশি দখলদার বাবরের সেনাপতি মীর বাকির হাতে ধ্বংস হলো তৎকালীন রাম মন্দির। বিগ্রহের কোনো ক্ষতি হয়নি। এই খবর পেয়েই বাবা শ্যামানন্দ প্রতিমাকে সরয়ুর জলে বিসর্জন দিয়ে দৈব বিগ্রহ নিয়ে চলে গেলেন বর্তমান উত্তরাখন্ডে। আর এদিকে মন্দিরে থাকা সমস্ত পূজারী, সেবক অন্যান্য কর্মচারীদের গণহত্যা করে মন্দির ধ্বংস করল বর্বর মীর বাকি। অবশ্য এটাই প্রথম প্রচেষ্টা ছিল না। এর আগেও ১০৩৩ সালে আর এক হানাদার শালার মাসুদ মন্দির ধ্বংসের চেষ্টা করলে আক্রমণ করে তাকে হত্যা করেন সুলাই দেব।

আসলে রাম মন্দির কোনো সাধারণ মন্দির নয়। এশিয়াতে রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক সংজ্ঞা প্রচলিত ছিল। আর গান্ধার থেকে শুরু করে আসমুদ্র হিমাচলসহ ব্রহ্মদেশ হয়ে সম্পূর্ণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে যে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচলন ছিল, অর্থাৎ তৎকালীন সংজ্ঞা অনুযায়ী ভারত রাষ্ট্রের বিস্তার ছিল তার আত্মা স্বরূপ ছিলেন ভগবান শ্রী রামচন্দ্র। আর সেই আত্মার জন্মস্থানই অযোধ্যার মন্দির। যদি কোনোভাবে এই মন্দিরকে ভারতীয়দের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া যেতে পারত, ভারতীয়দের ভুলিয়ে দেওয়া যেত এই মন্দিরের কথা তবে অন্যান্য ইসলামের হাতে নিশ্চিহ্ন হওয়া বাকি সমস্ত প্রাচীন জাতির মত ভারতীয়রাও একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। ধন্যবাদ আমাদের পূর্বপুরুষদের, যারা অশেষ অত্যাচার সহ্য করেছেন, জীবন দিয়েছেন, সম্মান দিয়েছেন নিজেদের সর্বস্ব বলিদান দিয়েছেন কিন্তু রাম মন্দির কে ভুলতে দেয়নি মানুষের মন থেকে। ভাগ্যিস দেননি, না হলে হয়তো ভারত নামে কোনো রাষ্ট্রের অস্তিত্বই থাকত না এই পৃথিবীতে।

রাম মন্দির ভাঙলেও মুঘল সম্রাটরা কিন্তু জন রোষের ভয়ে কখনোই এখানে মসজিদ নির্মাণ সম্পূর্ণ করতে পারেনি। অযু করার স্থান আর মিনারেট চিরকাল অসম্পূর্ণই থেকে যায়। পরবর্তীতে হিন্দুদের ক্ষোভ প্রচলন করার জন্য বাবরের নাতি আকবর "সীতা কি রসুই" আর "রামলালা বিরাজমান" স্থানে পুজো করার অনুমতি দিতে বাধ্য হয়।

ওই বাবরি মসজিদ আসলে রাম মন্দির ছিল কিনা এই নিয়ে প্রচুর ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। আমি শুধুমাত্র একটা ঐতিহাসিক প্রমাণ বলি। বিশ শতকের প্রথমভাগে রচিত, মৌলবী আবদুল গফফরের রচনা এবং সমসাময়িক নথিপত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, যুবক বাবর সুফী সাধকের ছদ্মবেশে কাবুল থেকে অযোধ্যা আসে, সম্ভবত খবর সংগ্রহের তাগিদে। এখানে এসে সে সুফী সন্ত শাহজালাল এবং সৈয়দ মুসা আশিকানের সান্নিধ্যে আসে। তারা বাবরকে হিন্দুস্তান বিজয় করার রহমত দানের বিনিময়ে, একটি বিশেষ অঙ্গীকার করিয়ে নেয়। কী ছিল সেই অঙ্গীকার? লালা সীতা রাম যিনি বইটির ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে পুরোনো সংস্করণটি হাতে পান, তিনি লিখেছেন, সুফী ফকিরদ্বয় বলেন, তারা তাকে আশীর্বাদ করবেন যদি সে জন্মস্থানে মন্দিরটি ভেঙে একটি মসজিদ নির্মানের প্রতিজ্ঞা করে।' বাবর সেই মত প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজের দেশে ফিরে যায়। আধুনিক সময়ে মন্দির পুনরুদ্ধারের প্রথম পদক্ষেপ দেখা যায় ১৮৫০ সালে। '৫৩ সালের দিকে নির্মোহী আখড়ার সাধুরা ওখানে স্বত্বাধিকার এবং উপাসনার অধিকার দাবী করেন। দিন দিন সংঘর্ষের পরিমাণ বেড়ে গেলে ১৮৫৯ সালে প্রশাসন একটি পাঁচিল তৈরি করে মসজিদ চত্বরকে দুটি অংশে ভাগ করে দেয়। ভেতরের অংশ মুসলিমদের আর বাইরের উঁচু অংশ 'রাম চবুতরা' হিন্দুদের। এই পাঁচিল টিকে ছিল ১৯৪৯ পর্যন্ত।

এরপর ১৮৮৩ সালে হিন্দুরা মন্দির তৈরির চেষ্টা করে। ডেপুটি কমিশনার ১৯ জানুয়ারী, ১৮৮৫ তারিখে মন্দির নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ওই বছরই ২৭ জানুয়ারী নির্মোহী আখড়ার সন্ত রঘুবর দাস একটি সিভিল স্যুট ফাইল করেন। প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম ট্রাস্টির লোক মহম্মদ আসগর দাবী করেন, সমগ্র জমি তাদের। ২৪শে ডিসেম্বর জজ পন্ডিত হরিকিষেণ সিং মামলাটি খারিজ করে দেন।

১৮৮৬ সালে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। এই বছর ১৮ ই মার্চ জেলার জজ এফ. ই. এ. চামিয়ারও লোয়ার কোর্টে এই সংক্রান্ত একটি আপিল খারিজ করে দিলেও সরকারিভাবে স্বীকার করে নেন যে, মসজিদটি হিন্দুদের পবিত্র ভূমির উপর নির্মিত হয়েছে তবুও তিনি স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষেই সওয়াল করেন। তাঁর বিবৃতি ছিলো "এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, মসজিদটি হিন্দুদের পবিত্র ভূমির উপর নির্মিত হয়েছে। কিন্তু ৩৫৬ বছর পূর্বে ঘটা ঘটনার কোন প্রকার সুরাহা করার জন্য অনেক দেরী হয়ে গেছে।"

পরবর্তী বড় ঘটনা ঘটে ডিসেম্বর ১৯৪৯-এর ২৪ ডিসেম্বর। সেদিন সেখানে নয়দিন ব্যাপী রামচরিতমানস পাঠ চলছিল। হঠাৎই সেখানে মুর্তি প্রকট হন। এই মূর্তিই আজকের 'রামলালা'। ইতিহাসে স্বীকৃতি তো ছিলই। এবার যেন চলে আসলো শেষ

লড়াইতে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আধ্যাত্মিক নির্দেশ।

খুব স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু এতে খুশি হননি। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থকে নির্দেশ দেওয়া হলো মূর্তি অপসারণের। ফৈজাবাদের তৎকালীন জেলা কালেক্টর ছিলেন ককে নায়ার। যেহেতু তখনও সংবিধান লাগু হয় নি, তাই মুখ্যমন্ত্রীর থেকে বেশী ক্ষমতা ছিলো জেলার কালেক্টরের। নায়ার স্পষ্টভাবে এমন কাজ করতে না করে দেন। পন্থ তখন মূর্তি বাইরে বের করে আনার অনুরোধ করে নায়ারকে। এবারও একই উত্তর দেন নায়ার। আসলে তিনি আইনি পদক্ষেপ নিতে চাইছিলেন। কেস কোর্টে যায় আর ফৈজাবাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিতর্কিত স্থানের গেট সর্বসাধারণের জন্য বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। পরবর্তী ৪০ বছর ওই গেট বন্ধ থাকে। এই ঘটনায় প্রশাসনের সঙ্গে নায়ারের বিরোধ চরমে ওঠে। নায়ার চাকরিতে ইস্তফা দেন, জনসংঘের হয়ে ভোটে লড়েন আর জিতে সাংসদও হন। মানুষের সাথে যে থাকে, মানুষও তার সাথে থাকে। এটাই তো গণতন্ত্রের জাদু।

এরপর ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৬১ সালে সুন্নী ওয়াকফ বোর্ড ওই স্থানের স্বত্বাধিকার এবং মূর্তি অপসারণের দাবী জানায়। বড় ঘটনা এই কারণে যে, এই প্রথম মুসলিম পক্ষ আইনগত ভাবে এই বিবাদে ঢুকলো। যে কোনো জমিসংক্রান্ত বিবাদে যদি দ্বিতীয় পক্ষ নিজেদের দাবী না জানায়, তবে ১২ বছর পর মোকদ্দমা তামাদি বলে ধরে নেওয়া হয়। ১৯৪৯-এ মূর্তি প্রকট হওয়ার ঠিক ১১ বছর পর, যখন ১২ বছর হতে মাত্র ১১ দিন বাকি তখন মুসলিম পক্ষের আবির্ভাব ঘটে! জমির অধিকার তাদেরই হলে এতদিন তারা কোথায় ছিলেন, আকস্মিক আগমনের কারণ কী, সেটা যথেষ্ট রহস্যাবৃত।

এর পরের ধাপে একজন আক্ষরিক অর্থেই মহান ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে দৃশ্যপটে। প্রত্নতত্ত্ববিদ কে. কে. মহম্মদ। ১৯৭৫-৭৬ সালে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ডাইরেক্টর জেনারেল বি. বি. লালের নেতৃত্বে একদল প্রত্নতত্ত্ববিদ 'আর্কিওলজি অফ রামায়ণ সাইট' নামক প্রকল্পে কাজ করা শুরু করেন। সেখানেই একমাত্র মুসলিম সদস্য হিসেবে ছিলেন ইনি। কে. কে. মহম্মদ তাঁর আত্মজীবনী, Njan Enna Bharatiyan' (I am Indian)-এ দ্বিধাহীন ভাবে লেখেন যে, খননকার্যে হিন্দু মন্দির পাওয়া গিয়েছিলো। কট্টরবাদীদের সাথে হাত মিলিয়ে বামপন্থী ঐতিহাসিকরা মুসলিম সমাজকে ক্রমাগত বিভ্রান্ত করেছেন। একটি বিখ্যাত চিঠিতে তিনি জানান যে খোদাই করে পাওয়া স্তম্ভগুলি কালো আগ্নেয় শিলানির্মিত ছিল। স্তম্ভের

নীচের দিকে পূর্ণকলস খোদাই করা ছিল। মন্দিরের স্থাপত্যরীতিতে পূর্ণকলস সমৃদ্ধি সূচিত করার আটটি উপায়ের একটি। আর এইভাবেই স্পষ্ট প্রমাণ হয়ে যায় যে মন্দির ভেঙে ওই মসজিদ নির্মাণ হয়েছিল। পরবর্তীতে এই কাজের জন্য তাকে উপর মহলের চাপও সহ্য করতে হয়েছিল।

একইসাথে অরুণ শৌরি, রাম স্বরূপ, সীতারাম গোয়েল, হর্ষ নারায়ণ, আভাস কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং বেলজিয়ামের বুদ্ধিজীবি কোনরাড এলস্টরা গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করতে লাগলেন 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' পত্রিকায়। লেখাগুলি দু'মলাটের মধ্যে প্রকাশিত হল ১৯৯০ সালের 'হিন্দু টেম্পলস: হোয়াট হ্যাপেনড টু দেম: আ প্রিলিমিনারি সার্ভে'। এই সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য সুসংবদ্ধভাবে নথিভুক্ত করেছিলেন দক্ষিণপন্থী বুদ্ধিজীবিরা। ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাস নাগাদ বিশ্বহিন্দু পরিষদ বাবরী মসজিদ সহ অন্যান্য সব হিন্দু মন্দির ভেঙে তৈরি স্থাপত্য অপসারণের জন্য আন্দোলন শুরু করে।

মানুষকে সচেতন করতে দেশের বিভিন্ন স্থানে রথযাত্রার পরিকল্পনা করা হয়। ১৯৮৪ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর নাগাদ 'সীতামাঢ়ী' থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত প্রথম রথযাত্রা হয়। ১৯৮৫ সালেও পঁচিশটা স্থানে রথযাত্রার আয়োজন করা হয়। ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৮৬ সালে একজন স্থানীয় উকিল উমেশ চন্দ্র পান্ডে ওই বিতর্কিত চত্বরে হিন্দুদের উপাসনার অনুমতি চেয়ে আপিল করেন। আপিল গ্রাহ্য হয় ও হিন্দুরা পূজার অনুমতি পায়।

এদিকে রাজীব গান্ধী তখন মুসলিম ভোটের লোভে নেহেরু বা ইন্দিরার থেকে একটু বেশিই মুসলিম তোষণ করে ফেলেছে। করার পরে মনে হয়েছে একটু ব্যালেন্স করা দরকার। ফলে হিন্দুদের সন্তুষ্ট করতে ফৈজাবাদ আদালতের রায়দানের পর একঘন্টারও কম সময়ে রাজীব সরকার ওইস্থানের দরজা খুলে দেয়। এতদিন শুধু পূজারীরাই বিগ্রহের নিত্যসেবা করতে পারতেন, অন্য হিন্দুদের প্রবেশাধিকারে সরকারী বিধিনিষেধ ছিলো। এবার সব হিন্দুরা ওই স্থানে পুজোর অধিকার পেয়ে গেলো।

এরপর নভেম্বর, ১৯৮৯ এর নির্বাচনের ঠিক আগে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ জন্মভূমিতে শিলান্যাসের অনুমতি পাওয়ায় টানাপোড়েন চরমে ওঠে। মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য সারা দেশ থেকে ইট আসতে শুরু করে। ভারতের প্রতিটি হিন্দু নিজের তরফ থেকে অন্ততপক্ষে একটি ইট মন্দিরের জন্য দেওয়ার অঙ্গীকার করে। আর একই সাথে চলতে থাকে আইনী লড়াই। এরপর ১৯৯০ সালে রাম মন্দির আন্দোলনের সমর্থনে বিজেপি সারা ভারতজুড়ে রথ যাত্রার কর্মসূচি নেয়। আডবাণীসহ বিজেপীর শীর্ষনেতৃত্ব প্রতিদিন গড়ে ৬টি সভা এবং ৩০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেন।

৩০শে অক্টোবর, ১৯৯০, দুপুর নাগাদ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদবের থেকে করসেবকদের উপর গুলিচালনার নির্দেশ পায় পুলিশ। এই আকস্মিক গুলিবর্ষণে চরম উত্তেজনা এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। পুলিশ অযোধ্যার রাজপথে ইতস্ততঃ করসেবকদের তাড়া করতে থাকে। ২ নভেম্বর আরেক দফা সংঘর্ষ হয়। পুলিশ তিনদিনে এই দ্বিতীয়বার গুলি চালালো। প্রচুর করসেবক নিহত হন। সরকারী মতে ১৭টি মৃত্যু, বেসরকারী মতে আরো বেশী। প্রায় ৫৬ জন। এই সংঘর্ষে কলকাতানিবাসী করসেবক রাম কোঠারী এবং শরৎ কোঠারী অযোধ্যায় আত্মবলিদান দিয়েছিলেন।

৫ ডিসেম্বর, ১৯৯২ সালে অপেক্ষাকৃত নরমপন্থী বলে পরিচিত অটল বিহারী বাজপেয়ী একটি সভায় তার বাক চাতুর্যের দ্বারা নির্দেশ দেন উচু পাথর ভেঙে সমতল করে দিতে। এই নির্দেশ বুঝতে কারোরই অসুবিধা হয় না। ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২ সালে হিন্দু সংগঠনগুলো দেড় লাখ করসেবক নিয়ে বাবরি মসজিদের সামনে সভার আয়োজন করে। উপস্থিত ছিলেন লালকৃষ্ণ

আডবানী, মুরলী মনোহর যোশী, উমা ভারতী সহ শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব। সভা যত এগোতে থাকে ততই উৎসাহী হয়ে উঠতে থাকে সাধারণ জনতা। দুপুর নাগাদ একজন করসেবক পুলিশের ব্যারিকেড টপকে মসজিদের মাথায় উঠে পড়ে আর উড়িয়ে দেয় শৌর্যবীর্যের ভারতীয়ত্বের প্রতীক একটি গৈরিক পতাকা। আর তারপরেই মানুষের বাঁধ ভেঙে যায়। জনরোষে, বিপুল আক্রোশে একে একে ভেঙে যায় পরপর তিনটি গম্বুজ। সমতল হয়ে যায় বাজপেয়ীর পাথর। শাপমুক্ত হয় ভারতের ইতিহাস। কিন্তু এটি একদমই বিনামূল্যে ছিল না। এরপরে ভারতের বিভিন্ন মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে ও বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নেমে আসে নারকীয় অত্যাচার। প্রচুর হিন্দু বাধ্য হয় উদ্বাস্তু হতে।

অপমানের প্রতীক বাবরি ধ্বংস তো হয়ে গেল। এবার সামনে ছিল পরের ধাপ অর্থাৎ আইনি বাঁধা পেরোনো। ও হ্যাঁ, প্রসঙ্গে দুইজনের কথা না বললেই নয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও আর উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিং। এই দুজনের সেদিন যেন নীলকণ্ঠ হয়ে সমস্ত সেকুলারি বিষ পান করে ফেলেছিলেন। গুলি চালানোর নির্দেশ দিতে কল্যাণ সিং রাজি হন নি। ফলে তার ক্ষমতা চলে যায়। কিন্তু ধর্মের জন্য তিনি সবকিছু সহ্য করতে রাজি ছিলেন। অন্যদিকে রাও মৌন সম্মতি জানিয়েছিলেন ভারতীয়ত্বের প্রতি। নিজের রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার মধ্যেও রামলালার ঘরে ফেরার রাস্তা তৈরি করে দিয়েছিলেন তিনি।

এরপর বাকি থাকে মন্দির নির্মাণের জন্য আইনি লড়াই। সেটা চলতে থাকে। ১৬ই অক্টোবর ২০১৯ এ নতুন কোট হিয়ারিং শেষ করে আর রায় জমা রাখে। ৯ই নভেম্বর আসে ফাইনাল রায়। আদালত জানায়, ASI এর খনন সংক্রান্ত নথি অনুসারে, মসজিদ কাঠামো এমন একটি স্থাপত্যের উপর নির্মিত হয়েছে, যা ইন্ডিক এবং নন-ইসলামিক। আদালত বিবাদিত ২.৭৭ একরের সম্পূর্ণটাই রাম মন্দির নির্মানে বরাদ্দ করে। এবং সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকে মসজিদ নির্মাণে অযোধ্যায় পাঁচ একর জমি বরাদ্দের জন্য উত্তরপ্রদেশ সরকারকে নির্দেশ দেয়। শিয়াদের দাবি সম্পূর্ণভাবে খারিজ হয়ে যায়। ভারত সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয় রাম মন্দির নির্মাণের জন্য তিনমাসের মধ্যে একটি ট্রাস্ট গঠনের। এই বিবাদিত জমি যা ভারতের সরকারের অধীনে, তা নবনির্মিত ট্রাস্টের হাতে তুলে দেওয়ার কথা বলা হয়। ১২ ডিসেম্বর, ২০১৯ সালে শীর্ষ আদালত উনিশটি রিভিউ পিটিশানের সবকটিই পত্রপাঠ খারিজ করে। ব্যস, আইনী লড়াই শেষ হলো। এবার বাকি রইল মন্দির নির্মাণ। মুক্ত হলো অযোধ্যা। ঘরে ফিরলেন সিয়ারাম।।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২০ সালের ৫ আগস্ট রাম মন্দির নির্মাণের সূচনার জন্য ভূমি পুজো করেন। ২০২৪ এর ২২ জানুয়ারি হয় রাম লালার প্রাণ প্রতিষ্টা। আর এই বছরের ২৫শ নভেম্বর সম্পূর্ণভাবে শেষ হয় মন্দিরের নির্মাণ কাজ। এই উপলক্ষ্যে ১০ ফুট উঁচু ও ২০ ফুট লম্বা একটি গৈরিক পতাকা উত্তোলন করেন প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি। পতাকায় স্বর্ণাভ সূর্যমুখী প্রতীক, 'ওঁ' অক্ষর এবং পবিত্র কোবিদার বৃক্ষের ছবি আঁকা ছিল। সম্মান, সাহস, ঐক্য ও সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার বার্তা বহন করাই হল এর উদ্দেশ্য।

রাম মন্দির পুনরুদ্ধার কি শুধু ভারতের গর্বের ঘটনা? উত্তর হল যে না, এটা শুধু ভারতের নয় সম্পূর্ণ পৃথিবী নন আব্রাহামিক জাতির গৌরব। যারা যারা ইসলাম বা খ্রিস্টান একেশ্বরবাদী আগ্রাসনের সামনে বিলুপ্ত হয়ে গেছে তাদের সবার গৌরব। তাদের সবার প্রতিনিধি এই আমরা ভারতীয়রা নিজেদের সম্মান নরুদ্ধার করতে পেরেছি। যতদিন পৃথিবীতে স্বাধীন মানুষ থাকবো, প্রতিদিন পৃথিবীতে বহুত্ববাদ থাকবে আর যতদিন পৃথিবীতে মানুষ বেঁচে থাকতে চাইবে - ততদিন তাদের সামনে এক আশার আলোকবর্তিকা হয়ে জেগে থাকবে রাম মন্দির পুনরুদ্ধার আন্দোলন।

ব্রিগেডে গীতাপাঠ
হিন্দুর রণহুংকার

জয়ন্ত গুহ

এ যেন আওরঙ্গজেবের শাসন কায়েম হয়েছে স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গে! এমন এক অবস্থায় গীতাই তো একমাত্র আশ্রয় ভারতীয় হিন্দু বাঙালীর, সনাতনী হিন্দুর। গীতাপাঠেই তো সে আহ্বান করবে অন্ধকার ঘুচিয়ে আশার আলোর। ধর্ম রক্ষায়, দুষ্কৃতির বিনাশে এবং সাধুসত্তার প্রকাশে, গীতাপাঠ ছাড়া কি উপায় আছে আর?

ব্রিগেডে গীতাপাঠ অনুষ্ঠানে জনসমুদ্র। হওয়ারই তো কথা ছিল। ৫ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ। গেরুয়া হয়ে গেল অতীতের লাল ব্রিগেড বা অতীত হতে চলা নীল ব্রিগেড। লাল বা নীল ব্রিগেড হয়তো কল্পনাও করতে পারেনি কি হতে চলেছে গীতাপাঠ অনুষ্ঠানে। কোনও রাজনৈতিক দলের পতাকা ছাড়াই সনাতনী ব্রিগেড সেদিন দেখিয়ে দিয়েছে শুধুমাত্র গীতাপাঠে-ই পাট পাট করে দুঃশাসনের 'সাজানো বাগান' কেঁপে উঠতে পারে। ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে পারে মা কালীকে প্রিজন ভ্যানে ওঠানোর দম্ভ। ব্রিগেড আসলে সেদিন আর ব্রিগেড ছিল না। হয়ে উঠেছিল ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র।

নতুন নয় এই গীতা পাঠের আয়োজন। আগেও করছে এমন অনুষ্ঠান সনাতন সংস্কৃতি সংসদ। তবে এবারের গীতাপাঠ যেন নিঃশব্দে হয়ে উঠেছিল তির নিক্ষেপের আগে টানটান ধনুকের ছিলা। বুক কাঁপানো বজ্র নির্ঘোষ। আকাশ বাতাস কাঁপানো সনাতনী হিন্দুর রণহুঙ্কার। সেই ভারতীয় হিন্দু বাঙালী যারা চোয়ালচাঁপা যন্ত্রণায় এই বাংলায় চোখের সামনে দেখেছে-শুনেছে এবং সয়েছে তাঁরই এক বাঙালী বোন বা কন্যাসম অভয়ার মৃত্যু এবং মৃত্যুর কারণ ধামাচাপা দিতে দুর্যোধন-দুঃশাসনদের নির্লজ্জ স্পর্ধা আর তাণ্ডব। এই সেই ভারতীয় বাঙালী যারা চোখ বুজে কাতর প্রার্থনা করেছে এক গগনভেদী টঙ্কারের যখন শুনেছে সন্দেশখালিতে পিঠে বানানোর নাম করে ভয় দেখিয়ে বাঙালী মা-বোনেদের রাতের অন্ধকারে তুলে নিয়ে যাওয়া হত।

শুধু কি সন্দেশখালি বা আরজিকর হাসপাতালে পাপের অন্ধকার? উত্তর থেকে দক্ষিণ, যেদিকে তাকাও ঘনঘোর অন্ধকার। গ্রাম থেকে শহর, হাসপাতাল থেকে ইশকুল-কলেজ-খেলার মাঠ-অর্থনীতি বা ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বত্র দুর্যোধন-দুঃশাসনদের দাপাদাপি। হুঙ্কার। কত সহ্য করবে মানুষ! রাজ্যজুড়ে পূর্ণ হয়েছে পাপের ঘড়া। চারিদিকে লোভ-লালসার করাল ছায়া। মধ্যযুগের অন্ধকার যেন নেমে এসেছে নবজাগরণের বাংলায়। শ্যামাপ্রসাদের বাংলায়! এমন এক অবস্থা যে খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সরকারি ভাবে ঘোষণা করছেন

যে মহিলারা যেন রাত ৮টার পরে বাইরে না বের হয়।

এক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে শুরু হয়েছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। আর এই বাংলায় ২০১১-২০২৪ কত যে বস্ত্রহরণ হয়েছে গুনে শেষ করা যাবেনা। কিন্তু প্রতিবাদ করার জো নেই সাধারণ মানুষের। করলেই পুলিশের নির্লজ্জ আক্রমণ বা দুর্যোধন বাহিনী 'ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেওয়ার' হুমকি দেবে। শুধু কি মানুষ, হাত পড়েছে আরাধ্য দেবতার ওপরেও। দিনেদুপুরে আরাধ্য দেবতার মূর্তি ভেঙ্গে দিচ্ছে। গলা কেটে দিচ্ছে বিগ্রহের। প্রতিবাদ করতে গেলে পুলিশের মার এবং প্রিজন ভ্যানে বন্দী মা কালী! এ যেন আওরঙ্গজেবের শাসন কায়েম হয়েছে স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গে! এমন এক অবস্থায় গীতাই তো একমাত্র আশ্রয় সনাতনী হিন্দুর। গীতাপাঠেই তো সে আহ্বান করবে অন্ধকার ঘুচিয়ে আশার আলোর। ধর্ম রক্ষায়, দুষ্কৃতির বিনাশে এবং সাধুসত্তার প্রকাশে, গীতাপাঠ ছাড়া কি উপায় আছে আর? এখনি তো আকাশবাতাস কাঁপিয়ে উচ্চারণ করার সময়-

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় হি সাধুনাং বিনাশয় চ দুষ্কৃতাম।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

(হে ভারত! যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই। সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই)।

গীতা সবার। গীতাপাঠও সবার। আমন্ত্রণও ছিল সবার। মুখ্যমন্ত্রীর জন্যও সাদর আমন্ত্রণ ছিল। যেতে পারেননি নয়, তিনি যাননি গীতা পাঠ অনুষ্ঠানে। এবং না যাওয়ার কারণ হিসাবে অফিসিয়ালি বলেছেন, "বিজেপির অনুষ্ঠানে আমি যাব কী করে? আপনারা আমাকে বলুন, এটা যদি নিরপেক্ষ অনুষ্ঠান হত আমি নিশ্চয়ই যেতাম। কিন্তু, আমি বিজেপির অনুষ্ঠানে কী করে যাব ? আমি তো একটা পার্টি করি। আমার তো একটা মতাদর্শ আছে।"

বোঝো কাণ্ড! প্রথমত গীতা পাঠের সঙ্গে বিজেপি-তৃণমূল আবার কোথা থেকে এল? যদি বিজেপির অনুষ্ঠান হত তাহলে তো মঞ্চে বিজেপির নেতা ও বিজেপির ব্যানার থাকতো। দ্বিতীয়ত দলমত নির্বিশেষে গীতা তো বাংলা-বাঙালী এবং ভারতের প্রতিটি নাগরিকের মতাদর্শ! গীতাকে 'বিজেপির অনুষ্ঠান' বললে তো বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতভূমির স্বাধীনতা আন্দোলনকে অস্বীকার করতে হয়। যুগান্তর, অনুশীলন সমিতির মত বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত বিপ্লবীদের কাছে গীতা ছিল মাতৃভূমির দাসত্বের শৃঙ্খল মোচনকল্পে এক মহান মন্ত্র! তাঁরা জীবনপণ সংগ্রামের বাক্য উচ্চারণ করতেন গীতাকে সাক্ষী মেনে। যাঁরা অহিংস উপায়ে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে পরিচালিত করেছিলেন তাঁদেরও অনেকেই প্রেরণা

নিয়েছিলেন গীতার কর্মযোগ থেকে। ঋষি অরবিন্দ, বালগঙ্গাধর তিলক, মহাত্মা গান্ধী, বিনোবা ভাবে, এ্যানি বেসান্ত, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী এবং আরও অনেকেই গীতার আদর্শকে জীবনের আদর্শ করে নিয়েছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসব কিছুকে কি অস্বীকার করতে পারেন? তিনি কি নিজেকে একজন গর্বিত ভারতীয় বাঙালী মনে করেন?

গীতাপাঠ-কে 'বিজেপির অনুষ্ঠান' বলে এড়িয়ে গেলে মমতা ব্যানার্জিকে তো বাংলার নবজাগরন, রামমোহন রায় এবং সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে তাঁর গীতার অনুপ্রেরনাকেও অস্বীকার করতে হয়। গীতার পাঁচটি অধ্যায় থেকে রামমোহন তাঁর শাস্ত্রীয় যুক্তির রসদ সংগ্রহ করেছিলেন।

গীতাপাঠ অনুষ্ঠানে না গিয়ে মমতা ব্যানার্জির যুক্তি, "যারা বাংলা-বিরোধী তাদের সঙ্গে আমি নেই।" তাহলে কি গীতার আদর্শকে জীবনের আদর্শ করে নেওয়া ঋষি অরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা বড় অংশ-সবই কি বাংলা বিরোধী? বাঙালী বিরোধী? আর সবকিছুকেই যদি আপনি অস্বীকার করেন তাহলে নিজেই নিজেকে আপনি প্রশ্ন করুন, এই বাংলায় একজন ভারতীয় বাঙালী হিসাবে আপনার অস্তিত্ব কোথায়?

গীতা বা গীতা পাঠের সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক দলেরই কোনও বিরোধিতা থাকতে পারেনা কেননা গীতা **'জাতীয় জীবনের অনির্বচনীয় ঐক্যতত্ত্ব'।** রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারতবর্ষ' প্রবন্ধ সংকলনের 'পরিচয়' প্রবন্ধে বলছেন, 'আতস-কাচের একপিঠে যেমন প্রাপ্ত সূর্যালোক এবং আর একপিঠে যেমন তাহারই সংহত দীপ্তিরশ্মি, মহাভারতেও তেমনি একদিকে ব্যাপক জনশ্রুতিরাশি আর একদিকে তাহারই সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতি—সেই জ্যোতিটিই ভগবদগীতা। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির যে সমন্বয় যোগ তাহাই সমস্ত ভারত ইতিহাসের চরমতত্ত্ব। ···ভারতবর্ষ একদিন আপনার সমস্ত ইতিহাসের একটি চরমতত্ত্বকে দেখিয়াছিল। মানুষের ইতিহাসের জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম অনেক সময়ে স্বতন্ত্রভাবে, এমনকি পরস্পর বিরুদ্ধভাবে আপনার পথে চলে; সেই বিরোধের বিপ্লব ভারতবর্ষে খুব করিয়া ঘটিয়াছে বলিয়াই এক জায়গায় তাহার সমন্বয়টিকে স্পষ্ট করিয়া সে দেখিতে পাইয়াছে। মানুষের সকল চেষ্টাই কোনখানে আসিয়া অবিরোধে মিলিতে পারে মহাভারত সকল পথের চৌমাথায় সেই চরম লক্ষ্যের আলোকটি জ্বালাইয়া ধরিয়াছে। তাহাই গীতা। ··· মহাভারতের এই গীতার মধ্যে লজিকের ঐক্যতত্ত্ব সম্পূর্ণ না থাকিতেও পারে, কিন্তু তাহার মধ্যে বৃহৎ একটি জাতীয় জীবনের অনির্বচনীয় ঐক্যতত্ত্ব আছে।'

এসআইআর-এর সাঁড়াশি চাপে তৃণমূলের দুয়ারে বিভীষিকা

দিব্যেন্দু দালাল

পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা নিয়ে গবেষণার রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৪ সালের বৈধ ভোটারসংখ্যার আনুমানিক হিসাব ৬,৫৭,০৬,৮৪৯, আর সরকারি ভোটার তালিকা অনুযায়ী সংখ্যা ৭,৬১,২৪,৭৮০। এর ফলে ১,০৪,১৭,৯৩১ জন অতিরিক্ত ভোটারের একটি সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত দেখা যায়, যা শতাংশে ১৩.৬৯%।

কেন তৃণমূল এসআইআর এত হুমকি হামকা দিচ্ছে? আসলে ভয় পাচ্ছে। ভয়টা কিসের? কেন তৃণমূল বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপে এত সরব বিরোধিতা করছে? হেরে যাওয়ার ভয়? হারানোর ভয়? বিহারের এসআইআর এবং বিহার নির্বাচনের ফলাফলে কি ভয় পেয়েছে তৃণমূল?

বিহারে নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকার Special Intensive Revision (SIR) বা বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা একটি প্যান্ডোরার বাক্স খুলে দিয়েছে। এতে স্পষ্ট হয়েছে কীভাবে জাল নথি ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার সাহায্যে বেআইনি ভোটাররা ভারতীয় গণতন্ত্রে প্রবেশ করে সেটিকে দূষিত করে তুলছে। এই SIR প্রক্রিয়ায় ভারতের নির্বাচন কমিশন বিহারে ৬০ লক্ষেরও বেশি অযাচাইকৃত ভোটার শনাক্ত করেছে। কিন্তু বিরোধী দলগুলো রাজনৈতিক ঝড় তুলেছে—তাদের দাবি, SIR আসলে একটি 'ষড়যন্ত্র', যার উদ্দেশ্য নাকি নির্দিষ্ট এক শ্রেণির ভোটারকে—বিশেষত মুসলিম ভোটারদের— তালিকা থেকে বাদ দেওয়া।

উল্লেখযোগ্যভাবে, সম্মানিত আইআইএম প্রতিষ্ঠানগুলোর অধ্যাপকদের একটি গবেষণাপত্র আগেই এ বিষয়ে সতর্ক করেছিল এবং ইঙ্গিত দিয়েছিল যে বিহারে ৭০ লক্ষেরও বেশি ভুয়ো ভোটার রয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই, বেআইনি বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত, আটক ও দেশে ফেরত পাঠানোর এই অভিযানে দেশের তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাজনৈতিক দলগুলো গভীর অস্বস্তি প্রকাশ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের নিরিখে SIR -এর গুরুত্ব

২০০২ সালে যখন ভারতের নির্বাচন কমিশন (ECI) শেষবার Special Intensive Revision (SIR) পরিচালনা করেছিল, সেই সময় থেকে ২০২৫ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ৬৬% বেড়েছে — ৪.৫৮ কোটি থেকে বেড়ে ৭.৬৩ কোটি হয়েছে। ECI–র তথ্য অনুযায়ী, ভোটার বৃদ্ধির শীর্ষ ১০ জেলার মধ্যে নয়টি জেলা বাংলাদেশ সীমান্তসংলগ্ন।

ECI–র তথ্য অনুযায়ী, যে নয়টি সীমান্ত জেলা সবচেয়ে বেশি ভোটার বৃদ্ধির সাক্ষী হয়েছে, সেগুলি হলো:

উত্তর দিনাজপুর (১০৫.৪৯% বৃদ্ধি), মালদা (৯৪.৫৮%), মুর্শিদাবাদ (৮৭.৬৫%), দক্ষিণ ২৪ পরগনা (৮৩.৩০%), জলপাইগুড়ি (৮২.৩%), কোচবিহার (৭৬.৫২%), উত্তর ২৪ পরগনা (৭২.১৮%), নদিয়া (৭১.৪৬%) এবং দক্ষিণ দিনাজপুর (৭০.৯৪%)। শীর্ষ ১০ জেলার একমাত্র অ-সীমান্ত জেলা হলো বীরভূম (৭৩.৪৪%)।

এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা এখন সারা বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল ভোটব্যাঙ্কের ভিত্তি তৈরি করেছে। তাই তিনি তাদের রক্ষা করতে মরিয়া — এবং এ কারণেই Special Intensive Revision (SIR)–এর প্রতি তাঁর এত তীব্র বিরোধিতা কোনওভাবেই বিস্ময়ের নয়।

আইআইএম-এর অধ্যাপকদের গবেষণাপত্রে উঠে এসেছে—২০২৪ সালের পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় ১ কোটি অতিরিক্ত ভোটার।

পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা নিয়ে, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট বিশাখাপত্তনম-এর সহকারী অধ্যাপক ড. মিলন কুমার এবং এসপি জৈন ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ-এর সহকারী অধ্যাপক (আইআইটি খড়গপুর এবং আইআইএম কলকাতার প্রাক্তন ছাত্র) ড. বিধু শেখরের গবেষণাপত্র "ইলেক্টোরাল রোল ইনফ্লেশান ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল: এ ডেমোগ্রাফিক রিকনস্ট্রাকশন অব লিজিটিমেট ভোটার কাউন্টস (২০২৪)", **যাতে দিনের আলোর মত পরিষ্কার যে পশ্চিমবঙ্গের ২০২৪ সালের ভোটার তালিকায় প্রায় এক কোটি অতিরিক্ত ভোটার থাকতে পারে। এতে ভোটার তালিকার স্ফীতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩.৬৯%। ভয়াবহ নিঃসন্দেহে।**

গবেষণাপত্রটি, যা ৭ আগস্ট ২০২৫-এ প্রকাশিত হয়েছে, ২০০৪ সালের ভিত্তি ভোটার তালিকা থেকে বর্তমান পর্যন্ত বেঁচে থাকা ভোটারের সংখ্যা, নতুন প্রজন্মের (১৯৮৬–২০০৬ সালে জন্মানো)

মাধ্যমে যুক্ত হওয়া ভোটার, এবং স্থায়ী নীট অভিবাসনের কারণে প্রয়োজনীয় সমন্বয়—এ সবকিছু অনুমান করতে নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকা, জনগণনা এবং সিভিল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের সরকারি তথ্যের উপর নির্ভর করেছে। গবেষকেরা প্রতিটি ধাপেই অত্যন্ত সংযমী ও রক্ষণশীল পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন।

এর মূল অনুসন্ধানটি তুলে ধরে যে পশ্চিমবঙ্গের ২০২৪ সালের ভোটার তালিকায় এক কোটিরও বেশি অতিরিক্ত নাম থাকতে পারে, যা আনুমানিক বৈধ ভোটারসংখ্যার তুলনায় ১৩.৬৯% বেশি।

গবেষণাটি ২০২৪ সালের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের বৈধ ভোটারসংখ্যার প্রমাণনির্ভর (empirical) অনুমান তিনটি ধাপে উপস্থাপন করেছে:

(১) ২০০৪ সালের ভোটার তালিকা থেকে বেঁচে থাকা ভোটারদের (survivors) হিসাব,

(২) ১৯৮৬ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে জন্ম নেওয়া নতুন ভোটার গোষ্ঠী থেকে সংযোজন, এবং

(৩) নেট স্থায়ী অভিবাসনের (net permanent migration) ভিত্তিতে সমন্বয়।

পরিশেষে গবেষকেরা এই তিনটি ফল একত্রিত করে ভোটার তালিকায় সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত (surplus) এন্ট্রির পরিমাণ নির্ণয় করেছেন।

বিশ্লেষণে উল্লেখ করা হয়েছে যে ২০২৪ সালের বৈধ ভোটারসংখ্যার আনুমানিক হিসাব ৬,৫৭,০৬,৮৪৯, আর সরকারি ভোটার তালিকা অনুযায়ী সংখ্যা ৭,৬১,২৪,৭৮০। এর ফলে ১,০৪,১৭,৯৩১ জন অতিরিক্ত ভোটারের একটি সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত দেখা যায়, যা শতাংশে ১৩.৬৯%।

এই রিপোর্ট অনুযায়ী, এক কোটিরও বেশি অতিরিক্ত নামের এই বিপুল উদ্বৃত্ত তৃণমূল কংগ্রেস-শাসিত পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন পরিচালনার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন তোলে। প্রতিবেদনে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে অতিরিক্ত নিবন্ধনের মাত্রা বহু কেন্দ্রের জয়ের ব্যবধানকেও ছাড়িয়ে গেছে, এবং এটি "জালিয়াতি, ছদ্মবেশী ভোটদান এবং রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর সুযোগ তৈরি করে।"

"গবেষণায় বলা হয়েছে যে নির্বাচনী তথ্যকে নাগরিক নিবন্ধন ডাটাবেস, আধার এবং আন্তঃরাজ্য অভিবাসন রেকর্ডের সঙ্গে আরও শক্তভাবে সমন্বিত করা অত্যন্ত জরুরি। শতবর্ষী মানুষের অস্বাভাবিক ক্লাস্টার বা বহু-স্থানে নিবন্ধনের মতো অসম্ভব ধরনের এন্ট্রি শনাক্ত করার জন্য অ্যালগরিদমিক পরীক্ষা, সঙ্গে ত্রৈমাসিক জনমিতি নিরীক্ষা—এগুলো রোলের নির্ভুলতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে পারে এবং ভোটারের আস্থা পুনরুদ্ধারে সহায়তা করতে পারে,"—গবেষণা প্রবন্ধে বলা হয়েছে।

গবেষণায় আরও সুপারিশ করা হয়েছে যে গত দুই দশকে যেখানে বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) হয়নি, পশ্চিমবঙ্গসহ সেই সকল রাজ্যে জরুরি ভিত্তিতে একটি নতুন SIR পরিচালনা করা উচিত। একটি নতুন SIR-এর মাধ্যমে বাড়ি-বাড়ি যাচাই, মৃত্যু-নথির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা, এবং কেন্দ্রভিত্তিক কৃত্রিম উপায়ে বাড়িয়ে দেওয়া (inflated) ভোটার পকেটগুলোকে অপসারণ করা সম্ভব হবে।

তৃণমূলের নাভিশ্বাস

স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) 'স্মরণ করিয়ে' দিয়েছেন যে তারা রাজ্য সরকারের কর্মী—ইসিআই-এর নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে ভোটারের নাম নির্বিচারে বাদ দেওয়া যাবে না।

এ বছর জুলাই মাসে বীরভূমে এক প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ভোটের তারিখ ঘোষণা হওয়ার পরেই কেবল নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব নেয়। তার আগে, আর তার পরেও প্রশাসন রাজ্য সরকারের অধীনেই থাকে। আপনারা রাজ্য সরকারের কর্মী। কাউকে অকারণে হয়রানি করবেন না।"

বিএলওদের জন্য তাঁর এই তথাকথিত 'স্মরণ' আসলে হুমকির মতোই শোনায়। নির্বাচন কমিশনের সততা নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং কমিশনকে বিজেপির ইশারায় চলার অভিযোগ তুলে তিনি আরও বলেন, "(ভোটার) তালিকা তৈরি হচ্ছে গুজরাটে বসে। বিজেপির একটি এজেন্সি এটা করছে। এর নামও আমি জানি। বাংলার ভোটার তালিকা থেকে যদি কারও নাম কাটার সাহস দেখেন, তবে ঢোল-নগাড়া, শাঁখ-কাঁসার (ছৌ নাচের ইঙ্গিত) সুরে আপনারা ঠিকই জবাব পাবেন। আমি বেঁচে থাকতে এনআরসি চালু হতে দেব না, ডিটেনশন ক্যাম্পও গড়তে দেব না।"

পশ্চিমবঙ্গেই সর্বাধিক সংখ্যক অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী জাল কাগজপত্র ও স্থানীয় সহায়তায় বসবাস করছে

স্পষ্টতই, তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী আশঙ্কা করছেন যে পশ্চিমবঙ্গে যদি বিশেষ নিবিড় পুনঃপর্যালোচনা (SIR) চালু হয়, তাহলে লক্ষ লক্ষ ভুয়ো ভোটার—বিশেষ করে জাল নথি সংগ্রহ করা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা—তালিকা থেকে বাদ পড়ে যাবে। এটা কোনো গোপন বিষয় নয় যে পশ্চিমবঙ্গ অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যার দিক থেকে শীর্ষে থাকা রাজ্যগুলোর একটি। গত তিন বছরে ২,৬৮৮ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

বাংলাদেশীরাই প্রমাণ করেছে অনুপ্রবেশের অভিযোগকে

উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয় ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তে স্থানীয় বাসিন্দা ও নিরাপত্তাকর্মীরা জানিয়েছেন যে নভেম্বরের শুরু থেকে—পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR) শুরু হওয়ার পর—বাড়ি ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করা অবৈধ/কাগজবিহীন বাংলাদেশীদের সংখ্যা চোখে পড়ার মতো বেড়ে গেছে।

SIR ঘোষণার পর সামাজিক মাধ্যমে বেশ কয়েকটি ভিডিও সামনে এসেছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে—বাংলাদেশ থেকে আসা অবৈধ অভিবাসীরা পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত চেকপোস্টগুলোর কাছে দল বেঁধে ঘোরাফেরা করছে। সবচেয়ে বেশি শেয়ার হওয়া ভিডিওগুলোর একটি হাকিমপুর (বসিরহাট) এলাকার, যেখানে লম্বা সারিতে মানুষজন ব্যাগ-বগি নিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে হাঁটতে দেখা যায়।

ডিডি নিউজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এদের অনেকেই বহু বছর ধরে ভারতে বেআইনিভাবে বসবাস করছিল—কেউ ১০ বছর, কেউ ৭, ৫ বা ২ বছর। অবাক করার মতো বিষয় হলো, তাদের মধ্যে কিছু জনের আধার কার্ডও ছিল এবং তারা ভারতে নিয়মিত কাজও পেয়ে গিয়েছিল। অনেকে ইটভাটায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করত, আবার কেউ কেউ রাপিডো বাইক ও ট্যাক্সি চালক হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করত—যা থেকে স্পষ্ট, তারা স্থানীয় জনজীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে এসব দল মূলত উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকা থেকে এসেছে, যেখানে সময়ের সঙ্গে বহু বাংলাদেশি নাগরিক বসতি গড়ে তুলেছে বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। আসন্ন SIR-কে কেন্দ্র করে অবৈধ অভিবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে, কারণ তারা আশঙ্কা করছে—ভোটার তালিকা কঠোরভাবে যাচাই-বাছাই ও নথিপত্র পরীক্ষা শুরু হলে তাদের পরিচয় ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

SIR ঘোষণার পর সীমান্তে যাতায়াত স্পষ্টভাবে বেড়ে গেছে, এবং এলাকাবাসী নিজেরাই সেই সব ভিডিও রেকর্ড করে সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করছেন। যখন ব্যবস্থা স্বচ্ছ হয়, তখন অবৈধ ভোটকে ঘিরে তৈরি হওয়া ইকোসিস্টেম ভেঙে পড়তে শুরু করে। এই দৃশ্যগুলোই তখন বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরে।

SIR প্রশাসনিক বিপর্যয় ফাঁস করল; ৭০ লাখ পর্যন্ত ভোটার বাদ পড়ার মুখে

পশ্চিমবঙ্গের SIR–এ বিপুল প্রশাসনিক গাফিলতি ধরা পড়েছে, যেখানে ২৮– ৩০ লাখ 'অ্যনম্যাপড' ভোটারকে বাধ্যতামূলক শুনানির মুখে পড়তে হচ্ছে, এবং ৫৪ লাখেরও বেশি নামকে 'অনকালেক্টিব্ল' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফেরত না আসা ফর্ম এবং খুঁজে না পাওয়া ভোটারের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকায়, রাজ্যটি এখন প্রায় ৬৫–৭০ লাখ নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার সম্ভাবনা–র মুখোমুখি।

পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR) এখন একটি সংকটজনক ধাপে পৌঁছেছে। আসন্ন নির্বাচনের আগে প্রায় ৬৫–৭০ লাখ ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারেন, যা ভোটাধিকার ও প্রতিনিধিত্ব নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ তৈরি করেছে। ৭.৬ কোটি ভোটারের তথ্য ডিজিটালাইজেশন ও যাচাই-কেন্দ্রিক SIR–এর প্রথম পর্যায় প্রায় শেষ হয়েছে, যেখানে ৯৯.৪% ফর্ম ইতিমধ্যেই ডিজিটালাইজড হয়েছে। তবু বেশ কিছু বড় ফাঁক রয়ে গেছে।

২৮–৩০ লাখ আবেদনকারীকে ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায়নি, এবং ভোটাধিকার রাখার জন্য এখন তাদের সরাসরি শুনানিতে হাজির হতে হবে। নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা দ্বারা পরিচালিত এই শুনানি ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত চলবে। ভোটারদের বিধিসম্মত ১৩টি SIR নথি সঙ্গে আনতে হবে।

এছাড়া, ৫৪.৬ লাখ ভোটারের নাম 'অনকালেক্টিব্ল' বা সংগ্রহযোগ্য নয় বলে ধরা হয়েছে—যার কারণ মৃত্যু, স্থানান্তর, খুঁজে না পাওয়া, বা ডুপ্লিকেশন। ডিজিটালাইজড ফর্মের ৭%–এরও বেশি এই শ্রেণিতে পড়ে, ফলে তারা ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশিতব্য খসড়া SIR তালিকায় থাকছে না। এদের মধ্যে—

২৩.৭ লাখের মৃত্যু হয়েছে,
১৯ লাখ অন্যত্র চলে গেছেন,
১০.১ লাখকে খুঁজে পাওয়া যায়নি,
১.২ লাখ নাম ডুপ্লিকেট।

এর বাইরে, প্রায় ২১,০০০ ভোটার যারা ফর্ম পেলেও তা ব্লক-স্তরের কর্তৃপক্ষকে ফেরত দেননি, তাদের একটি আলাদা তালিকা প্রকাশ করা হবে। এদের নামও খসড়া তালিকায় থাকবে না। তবে নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট করেছে—ইচ্ছুক ভোটাররা ফর্ম ৬ ব্যবহার করে নতুনভাবে আবেদন জানিয়ে তাদের নাম পুনর্বহালের দাবি করতে পারবেন।

যাই হোক, একটা বিষয় ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে SIR -এর খসড়া তালিকা থেকে আগেই বাদ যাচ্ছে একটা বড় সংখ্যার ভোটার। ৯ ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সংখ্যাটা ৫৭ লক্ষ ছাড়িয়েছে। অসমর্থিত সূত্রে এটাও জানা যাচ্ছে যে খসড়া তালিকা প্রকাশের পর প্রায় ১ কোটি মানুষকে শুনানীতে ডাকা হতে পারে। উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে সেখান থেকেও বাদ যেতে পারে একটা বড় অংশ।

তথ্য বলছে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস পায় মোট ২ কোটি ৮৭ লক্ষ ৩৫ হাজার ৪২০ ভোট এবং বিজেপি পেয়েছিল ২ কোটি ২৮ লক্ষ ৫০ হাজার ৭১০ ভোট, অর্থাৎ দু'দলের মধ্যে ব্যবধান ছিল ৫৮ লক্ষ ৮৪ হাজার ৭১০ ভোটের। এবার ভাবুন SIR -এর সফল অভিযানের ফলে সব মিলিয়ে ১ কোটিরও বেশী নাম যদি ভোটার তালিকা থেকে বাদ যায় তবে এই ব্যবধান আদৌ থাকবে কি?

খোদ মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী ক্ষেত্র ভবানীপুরে অসংগৃহীত এনুমারেশন ফর্মের সংখ্যা ৪২ হাজারের কাছাকাছি অথচ সেখান থেকে ২০২১ সালে রুদ্রনীল ঘোষ তৃণমূলের শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন ২৯ হাজারের মত ভোটে! এই ৪২ হাজার ভুয়ো ভোটার বাদ দিলে পরিসংখ্যানটা কী হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

হুমায়ুনের বাবরি তৃনমূলেরই প্রডাক্ট

স্বাতী সেনাপতি

"...হুমায়ুন যে ভাষা ব্যবহার করছেন, তা হোসেন সোহরাওয়ার্দী আর মহম্মদ আলি জিন্নার 'ভাষার' মতো। এটা সহাবস্থানের ভাষা নয়, যুদ্ধ ঘোষণা। সরস্বতী পুজো করতে গেলে আদালতের অনুমতি নিতে হয়, মা কালীকে পর্যন্ত প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়। অথচ রেজিনগরে বিনা অনুমতিতে লাখো মানুষের জমায়েত, লাউডস্পিকার, চাঁদা সংগ্রহ,সবই পুলিশি মদতে হয়েছে"-শুভেন্দু অধিকারী।

দশকের পর দশক ধরে ভারতে বাবরি মসজিদ নিয়ে বিতর্ক চলছে আর সেই বিতর্কে আরও ইন্ধন জুগিয়েছেন তৃণমূলের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাবরি মসজিদ বিতর্ককে সামনে নিয়ে এসেছেন তিনি। তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, কবিরের আচরণ "মহম্মদ আলি জিন্নাহর মতো।" সরাসরি তাঁর অভিযোগ, "১,০০০ পুলিশ মোতায়েন করে প্রশাসনের সহায়তায় মুঘল–পাঠান আক্রমণকারীর নামে উদযাপন হয়েছে সেখানে। বাবর একজন ধর্ষক, লুটেরা। তিনি ভারতীয় নন। ভারত দখল করতেই এসেছিলেন। মন্দির ধ্বংস করতে, মানুষকে জোর করে ধর্মান্তর করতে। দেশের সোনা–হিরে–রত্ন লুটে বিদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর নামে কিছু তৈরি করার বিরোধিতা করাই উচিত। হুমায়ুন যে ভাষা ব্যবহার করছেন, তা হোসেন সোহরাওয়ার্দী আর মহম্মদ আলি জিন্নার 'ভাষার' মতো। এটা সহাবস্থানের ভাষা নয়, যুদ্ধ ঘোষণা। সরস্বতী পুজো করতে গেলে আদালতের অনুমতি নিতে হয়, মা কালীকে পর্যন্ত প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়। অথচ রেজিনগরে বিনা অনুমতিতে লাখো মানুষের জমায়েত, লাউডস্পিকার, চাঁদা সংগ্রহ,সবই পুলিশি মদতে হয়েছে।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২০১৯ সালের ৯ই নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট চূড়ান্ত রায় দেয় রাম জন্মভূমি এবং বাবরি মসজিদ বিতর্ক মামলায়। সেই রায় অনুযায়ী মুসলিমদের ৫ একর জমি প্রদান করা হয় এবং মুসলিম সমাজও সেই রায়কে সম্মান জানায়। কিন্তু হঠাৎ করেই নির্বাচনের আগে আবারও বাবরি মসজিদ প্রসঙ্গ তুলে আনা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছু নয়। একসময় মানুষের প্রতিবাদে যে মুর্শিদাবাদকে ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করেছিল সেই মুর্শিদাবাদকেই আজ কিছু অসাম্প্রদায়িক মানুষ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছে।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট এর সন্ধ্যা, ভারতের আকাশে স্বাধীনতার পতাকা উড়ছে কিন্তু অন্যদিকে কয়েকটি জেলায় আলো নিভে আসছে। মুক্তির স্বাদ নেই বরং ভয় আর আতঙ্কে দিন কাটছে মুর্শিদাবাদ সহ বাংলার বেশ কিছু জেলার মানুষদের। কারণ সেদিন মুর্শিদাবাদের আকাশে পাকিস্তানের পতাকা উড়েছিল।

ঐতিহ্যমন্ডিত মুর্শিদাবাদ বরাবরই হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐক্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হত। কিন্তু কালের স্রোতে রাজনৈতিক চরিত্রের পালাবদলে মুর্শিদাবাদ এর চিত্রটাও দিন দিন বদলে যাচ্ছে। ইতিহাস ঘাটলে জানা যায়, ভারত ভাগের সময়

মুর্শিদাবাদ কিন্তু ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে ভারতের মুক্তি ঘটে। কিন্তু মুর্শিদাবাদ গিয়ে পড়ে পূর্ব পাকিস্তানে। সেদিন বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ারের মাঠে উত্তোলন করা হয়েছিল পাকিস্তানের পতাকা।

১৯৪৭ সালে ভারতের মানচিত্র তৈরির মূল দায়িত্বে ছিলেন স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ ও তার বাউন্ডারি কমিশন। এই কমিশন বাংলা এবং পাঞ্জাব প্রদেশকে ধর্মীয় ভিত্তিতে ভাগ করে একটি সীমান্ত তৈরি করেছিল যাকে বলা হয় র‍্যাডক্লিফ লাইন। কোন অংশ ভারতের মধ্যে থাকবে এবং কোন অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হবে তা সবটাই ঠিক করেছিলেন স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ। এই মানচিত্র অনুযায়ী মুর্শিদাবাদকে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শুধু মুর্শিদাবাদ নয়, মালদা, নদিয়া সহ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও উত্তর চব্বিশ পরগনার বেশ কিছু অংশ পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে যায়। কিন্তু এই দেশ বিভাজনকে মেনে নিতে পারেননি অনেক মানুষই।

হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে যাওয়ার ফলে এলাকাবাসীর মধ্যে ভয়াবহ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ১৫ আগস্ট যখন ভারতের আকাশে স্বাধীনতার পতাকা উড়ছে তখন মুর্শিদাবাদের মানুষের মনে প্রতিবাদের আগুন জেগে উঠছে ধীরে ধীরে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সহ নদিয়ার রাজ পরিবারের সদস্যরা এই প্রতিবাদে শামিল হন এবং পৌঁছে যান কলকাতায় ব্রিটিশ প্রশাসনের দরবারে। টানা তিন দিন ধরে চলেছিল এই প্রতিবাদ। প্রতিবাদের তীব্রতায় তৎকালীন ভারতের শেষ ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন মানচিত্র বদল করতে সিদ্ধান্ত নেন। এই হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিকে ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করতে নির্দেশ দেন তিনি। ১৭ আগস্ট মধ্যরাতে নতুন করে মানচিত্রের সংশোধন করা হয় এবং তারপরে সরকারিভাবে ১৮ আগস্ট মুর্শিদাবাদকে ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাংলার ইতিহাস এমনই কিন্তু সেই ইতিহাসের কথা ভুলতে বসেছে আজ বেশ কিছু মানুষ। অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতীক মুর্শিদাবাদকে হাতিয়ার করে রাজনীতির ময়দানে বিতর্ক সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে তারা।

একদিকে নবাবী রাজ এবং অন্যদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের লড়াইয়ের চিহ্ন মুর্শিদাবাদের গায়ে আজও লেগে গেছে। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মিলিত সংগ্রামেই মুর্শিদাবাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বর্তমানে কিছু সাম্প্রদায়িক মানুষের উস্কানি সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে।

ইতিহাস বলে পুজো, ঈদ ও বিজয়ার সম্মেলনের জন্য নবাব ওয়াসেফ আলি মির্জা দক্ষিণ দরওয়াজার সামনের একটি জমি রেজিস্ট্রি করে দেন। সেই জমিতেই আজও দুর্গাপুজো হয়। নবাবী আমল থেকেই মুর্শিদাবাদ ছিল বহু ধর্মীয় সহবাস্তানের

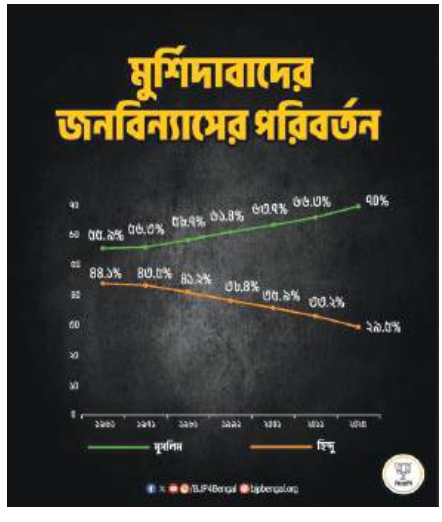

পীঠস্থান। আজ এই মুর্শিদাবাদ কালিমালিপ্ত হয়েছে কিছু সাম্প্রদায়িক মানুষের জন্য। ধর্মীয় উস্কানির মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক লাভের আশায় কিছু মানুষ নেমে পড়েছে বাবরি মসজিদ নির্মাণের জন্য।

বর্তমানে মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ প্রতিষ্ঠা নিয়ে ধর্মীয় উত্তেজনার সৃষ্টি করা হয়েছে। মুসলিম পোষণকারী দেশগুলির প্ররোচনায় মুর্শিদাবাদকে ভারত থেকে

আলাদা করে দেওয়ার পথকে আরও সুচারু করা হচ্ছে। তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বাবরি মসজিদ তৈরীর এই পরিকল্পনা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। মনে করা হচ্ছে, এ শুধু বিতর্ক নয় বরং মানুষের মধ্যে ধর্মীয় উত্তেজনা তৈরি করার চক্রান্ত। এক সময় যে মুর্শিদাবাদকে প্রতিবাদের মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল তাকে আবারো যেন ভারত থেকে আলাদা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই উদ্যোগ শুধু ধর্মীয় পদক্ষেপ নয় বরং এটি আগামীতে জাতীয় ঐক্য নষ্ট করতে পারে। যার ফল হতে পারে ভয়াবহ।

প্রশ্ন উঠছে হুমায়ুনের 'বাবরি মসজিদ' নির্মাণের জন্য এত টাকা আসছে কোথা থেকে? কে দিচ্ছে? এ নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সরাসরি বলেছেন, "এ টাকা তৃণমূলের টাকা। হুমায়ুন কবীরকে তৃনমূলই তৈরি করেছে। তৃণমূলের এটা প্ল্যান 'বি'। ভোট লুঠ না করে জিততে না পারলে হুমায়ুন আছে। তারপর পশ্চিম বাংলাদেশ বানিয়ে জিতব। হুমায়ুনের এত সাহস আছে রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত মুখ্যমন্ত্রী থাকবার পড়ে, তার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে, তার অনুমোদন ছাড়া হুমায়ুন কবীর বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে দিচ্ছে? আর রাজ্যের মানুষের এত সাহস আছে যে প্রকাশ্যে হুমায়ুন কবীরকে টাকা দিচ্ছে আর ইট নিয়ে যাচ্ছে? তার কারণ হচ্ছে পুরোটাই তৃণমূল। 'এ' আর 'বি'। মানুষ এটা বোঝে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ রাজনৈতিক ভাবে অচেতন নয়। আর মূর্খ নয়।"

বাস্তুচ্যুত হিন্দু শরণার্থীদের প্রতি ঐতিহাসিক অবিচার কংগ্রেসের

সংশোধন করেছে নরেন্দ্র মোদী সরকার

১০ অক্টোবর ২০২৫, নয়াদিল্লিতে 'দৈনিক জাগরণ' আয়োজিত **'নরেন্দ্র মোহন স্মৃতি বক্তৃতা'**-য় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী **শ্রী অমিত শাহ** তাঁর শাণিত যুক্তি ও তথ্যে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন কিভাবে অনুপ্রবেশের ফলে দ্রুত বদলে গেছে জনসংখ্যার মানচিত্র এবং আক্রান্ত হয়েছে দেশের গণতন্ত্র। ভয়াবহ অবস্থা পশ্চিমবঙ্গ ও অসম রাজ্যে। এই সংখ্যায় তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতার **প্রথম কিস্তি।**

বন্ধুরা, আজ আমাকে পরস্পর সংযুক্ত ৩টি বিষয়—অনুপ্রবেশ, জনসংখ্যার পরিবর্তন এবং গণতন্ত্র—সম্পর্কে আমার ভাবনা আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আমি আপনাদের সামনে অকপটে সব কথা বলতে চাই। এসব নিছক পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিষয় নয়; যদি প্রত্যেক ভারতীয়, বিশেষ করে যুবসমাজ যারা আগামী ৫০, ৬০ বা ৭৫ বছর ধরে এই জাতিকে বাঁচিয়ে রাখবে এবং দেশের ভবিষ্যৎ গঠন করবে, তাঁরা যদি এই বিষয়গুলো না বোঝে এবং এর পরিণতি সম্পর্কে সচেতন না হয়, তাহলে আমরা আমাদের দেশ, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ভাষা বা আমাদের স্বাধীনতাকে সত্যিই রক্ষা করতে পারব না। এই ৩টি বিষয়ের মধ্যে গভীর যোগাযোগ আছে। আমি জানি যে আজ আমি যা বলব, তা হয়তো সবাইকে খুশি করবে না। কিন্তু সত্য জানার পরেও যদি আমি নীরব থাকি, তবে আমি আমার কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হব এবং সেটা আমি হতে দিতে পারি না।

বন্ধুরা, আমাদের দেশে ১৯৫১, ১৯৭১, ১৯৯১ এবং ২০১১ সালে জনগণনা হয়েছিল। আমি যা উপস্থাপন করতে চলেছি তা হলো সেই আদমশুমারির প্রতিবেদনগুলোর একটি তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ, আমার ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা নয়। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের আদমশুমারিতে ঐতিহ্য অনুসরণ করে ধর্ম সম্পর্কিত একটি প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১৯৫১ সাল থেকে চলে আসা সেই সিদ্ধান্তের কারণ আমি জানি না, তবে এই সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাবেই আমার দল নেয়নি, কারণ তখন আমার দলের অস্তিত্বই ছিল না। সরকারি নথি অনুযায়ী, ১৯৫১ সালের আদমশুমারিতে হিন্দুরা জনসংখ্যার ৮৪% এবং মুসলমানরা ৯.৮% ছিল। ১৯৭১ সালের মধ্যে হিন্দুদের হার কমে ৮২% হয়, আর মুসলমানদের হার বেড়ে ১১% হয়। ১৯৯১ সালে হিন্দুরা ছিল ৮১%, মুসলমানরা ১২.১২%; এবং ২০১১ সালের মধ্যে হিন্দুরা কমে ৭৯% হয়, আর মুসলমানরা বেড়ে ১৪.২% হয়। এখন, আপনারা হয়তো ভাবছেন যে আমি কেন শুধু এই দুটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর কথাই উল্লেখ করছি। এর কারণ হলো আমি অনুপ্রবেশের প্রেক্ষাপটে কথা বলছি এবং পরে ব্যাখ্যা করব যে এটি আমাদের দেশের ঐতিহাসিক বিভাজনের সাথে কিভাবে যুক্ত।

স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের আদমশুমারিতে ঐতিহ্য অনুসরণ করে ধর্ম সম্পর্কিত একটি প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১৯৫১ সাল থেকে চলে আসা সেই সিদ্ধান্তের কারণ আমি জানি না, তবে এই সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাবেই আমার দল নেয়নি, কারণ তখন আমার দলের অস্তিত্বই ছিল না। সরকারি নথি অনুযায়ী, ১৯৫১ সালের আদমশুমারিতে হিন্দুরা জনসংখ্যার ৮৪% এবং মুসলমানরা ৯.৮% ছিল। ১৯৭১ সালের মধ্যে হিন্দুদের হার কমে ৮২% হয়, আর মুসলমানদের হার বেড়ে ১১% হয়। ১৯৯১ সালে হিন্দুরা ছিল ৮১%, মুসলমানরা ১২.১২%; এবং ২০১১ সালের মধ্যে হিন্দুরা কমে ৭৯% হয়, আর মুসলমানরা বেড়ে ১৪.২% হয়।

যদি ধর্মীয় ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত না হতো, তাহলে হয়তো আদমশুমারিতে ধর্ম লিপিবদ্ধ করার কোনো প্রয়োজনই পড়ত না। কিন্তু যেহেতু দেশভাগ ধর্মের ভিত্তিতে হয়েছিল, তাই হয়তো তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্ব ধর্মের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করাকে প্রয়োজনীয় মনে করেছিল।

১৯৫১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে হিন্দু জনসংখ্যার হার প্রায় ৪.৫% হ্রাস পেয়েছে, পক্ষান্তরে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ২৪.৬% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিবর্তনের ব্যাখ্যা কেবল জন্মহার নয়, এটি মূলত সীমান্ত অতিক্রম করে আসা অনুপ্রবেশের ফল।

ধর্মীয় ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হওয়ার পর পাকিস্তান এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশ নামে দুটি নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। আমাদের সীমান্ত

অঞ্চলের জনসংখ্যার পরিবর্তন এই দুই এলাকা থেকে আসা অবৈধ অনুপ্রবেশের ফলেই হয়েছে। আসুন আমরা দেখে নিই প্রতিবেশী দেশগুলোতে কি ঘটেছিল, যা একসময় অবিভক্ত ভারতের অংশ ছিল।

১৯৫১ সালে পাকিস্তানের জনসংখ্যার ১৩% ছিল হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুরা ছিল ১.২%। বর্তমানে পাকিস্তানে হিন্দুদের সংখ্যা মাত্র১.৭৩%। বাংলাদেশে একসময় হিন্দুরা জনসংখ্যার ২২% ছিল, কিন্তু এখন তা কমে ৭.৯%-এ দাঁড়িয়েছে। আফগানিস্তানে একসময় প্রায় ২,২০,০০০ হিন্দু ও শিখ ছিল, কিন্তু আজ তাদের সংখ্যা মেরেকেটে ১৫০ জন।

আমি এই সংখ্যাগুলো হিন্দু-মুসলমান তুলনা করার জন্য উল্লেখ করছি না, বরং অনুপ্রবেশকারী এবং শরণার্থীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যটি বোঝানোর জন্য বলছি। যে হিন্দুদের সংখ্যা কমেছে, তারা ধর্মান্তরিত হননি, বরং অনেকেই পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। এর বিপরীতে, এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি কেবল স্বাভাবিক বৃদ্ধির ফল নয়; একটি বড় অংশ সময়ের সাথে সাথে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছে।

দেশভাগের সময় এই মর্মে চুক্তি হয়েছিল যে উভয় দেশের সব ধর্মের মানুষ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে। ভারত এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে — আমাদের সংবিধানের ১৯ এবং ২১ অনুচ্ছেদ সকল নাগরিককে সুরক্ষা প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়। কিন্তু পাকিস্তান এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ নিজেদেরকে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে। এর ফলে ব্যাপক নিপীড়ন ও অত্যাচারের ঘটনা ঘটে, যা অনেক হিন্দুকে নিরাপত্তার খোঁজে ভারতে পালিয়ে আসতে বাধ্য করে।

সেই সময় ভারতের নেতারা তাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন, "এখন পরিস্থিতি অশান্ত, আপনারা এখনই আসবেন না। কিন্তু যখনই আপনারা ফিরতে চাইবেন, ভারতে আপনাদের সবসময় স্বাগত জানানো হবে।" এটি ছিল নেহরু-লিয়াকত চুক্তির একটি অংশ, যা ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং স্বাক্ষর করেছিলেন।

যারা শেষ পর্যন্ত এসেছিলেন, তাদের শরণার্থী হিসেবে গ্রহণ করা হলেও নাগরিকত্ব দেওয়া হয়নি। ভেবে দেখুন: কেউ এসেছেন

১৯৫১ সালে পাকিস্তানের জনসংখ্যার ১৩% ছিল হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুরা ছিল ১.২%। বর্তমানে পাকিস্তানে হিন্দুদের সংখ্যা মাত্র ১.৭৩%। বাংলাদেশে একসময় হিন্দুরা জনসংখ্যার ২২% ছিল, কিন্তু এখন তা কমে ৭.৯%-এ দাঁড়িয়েছে। আফগানিস্তানে একসময় প্রায় ২,২০,০০০ হিন্দু ও শিখ ছিল, কিন্তু আজ তাদের সংখ্যা মেরেকেটে ১৫০ জন। আমি এই সংখ্যাগুলো হিন্দু-মুসলমান তুলনা করার জন্য উল্লেখ করছি না, বরং অনুপ্রবেশকারী এবং শরণার্থীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যটি বোঝানোর জন্য বলছি। যে হিন্দুদের সংখ্যা কমেছে, তারা ধর্মান্তরিত হননি, বরং অনেকেই পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। এর বিপরীতে, এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি কেবল স্বাভাবিক বৃদ্ধির ফল নয়; একটি বড় অংশ সময়ের সাথে সাথে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছে।

১৯৬৫ সালে, কেউ ১৯৭১, ১৯৮১, ১৯৯১, এমনকি ২০০১ সালে; এখন চারটি প্রজন্ম পার হয়ে গেছে, তবুও তারা রাষ্ট্রহীন হয়ে রয়ে গেছেন। কেন? কারণ দেশভাগের রেখা টানার সময় তারা ঘটনাক্রমে সীমান্তের অন্য পাশে বাস করছিলেন, এমন একটি বিভাজন যা ভারত কখনও চায়নি কিন্তু গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৫১ সালে ভারত গুরুত্বপূর্ণ এক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, যারা বাস্তুচ্যুত হয়েছেন তারা ফিরে আসতে পারবেন এবং তাদের নাগরিক হিসেবে গ্রহণ করা হবে। কিন্তু কয়েক দশক ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষ নাগরিকত্বের আইনি অধিকার ছাড়াই অনিশ্চিত অবস্থায় রয়ে গেছেন এদেশে।

যখন ভারতীয় জনতা পার্টি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল এবং শ্রী নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হলেন, তখন আমরা এই ঐতিহাসিক অবিচার সংশোধন করতে এবং সেই শরণার্থীদের অবশেষে নাগরিকত্ব প্রদান করার জন্য নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন (সিএএ) নিয়ে আসি।

তা সত্ত্বেও একটি ব্যাপক ও বিভ্রান্তিকর প্রচার চালানো হয়েছিল যে সিএএ মুসলমানদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেবে। বারবার আমি এ নিয়ে স্পষ্ট করে বলেছি, যা গণমাধ্যম অনেকাংশেই উপেক্ষা করেছে। কিন্তু সত্যটা খুবই সহজ: সিএএ কাউকে তার নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করতে পারে না এবং করে না। এটি কেবল নির্যাতিত শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদান করার আইন। এই আইনে এমন একটিও বিধান নেই যা হিন্দু, মুসলিম, শিখ বা খ্রিস্টানদের নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করবে। সিএএ আসলে ছিল এক সংশোধন, ১৯৫১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত হওয়া ভুলগুলোর একটি নৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রতিকার। মোদী সরকার প্রথমে এই ধরনের শরণার্থীদের দীর্ঘমেয়াদী ভিসা, তারপর বসবাসের সনদ (প্রমাণপত্র) এবং অবশেষে পূর্ণ নাগরিকত্বের পথ করে দিয়েছে। এই আইনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী এমন একটি কাজ করেছেন, যাকে আমি একটি জাতীয় প্রতিজ্ঞাপালন বলব, এবং এর মাধ্যমে তিনি স্বয়ং জওহরলাল নেহরুর করা একটি প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ করেছেন।

(ভাষণের পরবর্তী অংশ জানতে নজর রাখুন 'বঙ্গ কমলবার্তা'র জানুয়ারি সংখ্যায়)।

ছবিতে খবর

বিজেপি সল্টলেক কার্যালয়ে বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব।

ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আয়োজিত মিডিয়া প্রশিক্ষণ কর্মশালায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব।

জেলা সভাপতিদের নিয়ে কলকাতায় বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব।

ছবিতে খবর

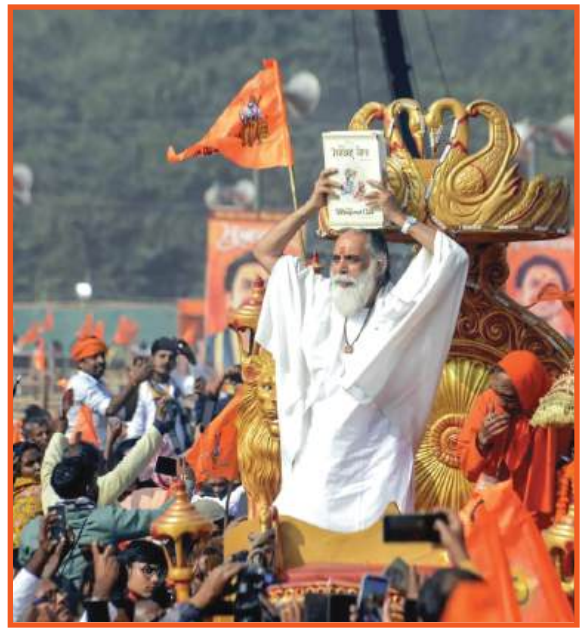

ব্রিগেডে 'লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ' অনুষ্ঠানে মানুষের উচ্ছ্বাস।

ছবিতে খবর

এসআইআর নিয়ে মিথ্যাচারের প্রতিবাদে বিজেপি বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার ডাকে রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য্য সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী শান্তনু ঠাকুর এবং বিজেপি বিধায়ক শ্রী সুব্রত ঠাকুরের উপস্থিতিতে "পরিবর্তন সংকল্প সভা"।

নয়াদিল্লিতে সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বিশেষ বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সকল সাংসদ।

নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ-এর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে আলোচনায় বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী।

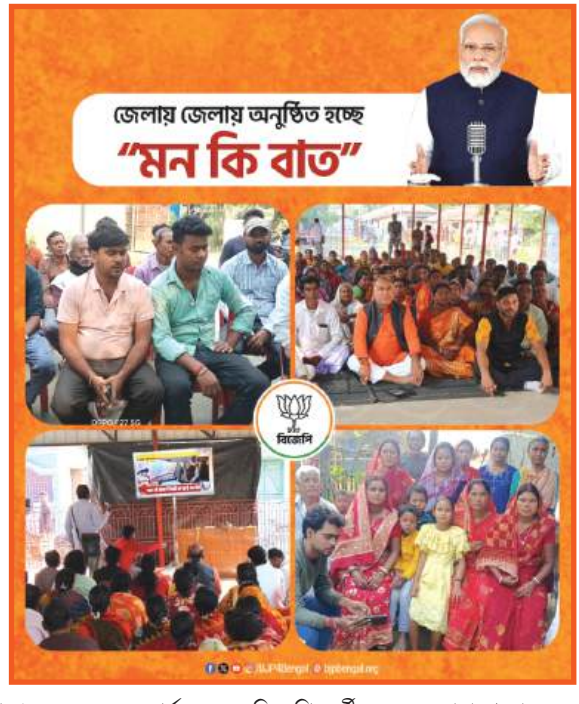

পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জির 'মন কি বাত'-এর ১২৮ তম পর্ব শুনছেন বিজেপি কর্মীবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষ।

পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে তৃণমূল সরকারের সীমাহীন চুরি, দুর্নীতি, খুন, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন এবং এসআইআর নিয়ে মিথ্যাচারের প্রতিবাদে জেলায় জেলায় 'পরিবর্তন সংকল্প পথসভায়' বিজেপি রাজ্য, জেলা নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

ছবিতে খবর

বিজেপি কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার ডাকে 'পরিবর্তন সংকল্প সভা'-য় জনসমুদ্রে বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ জেলা নেতৃত্ব।

মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার দাঁতন বিধানসভায় 'পরিবর্তন যাত্রা'-য় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বারাসাত ও কলকাতা উত্তর শহরতলী জেলার বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য সহ জেলা নেতৃত্ব।

হুগলি সাংগঠনিক জেলায় বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য ও বিজেপি জেলা নেতৃত্ব।

তৃণমূল সরকারের দুর্নীতি ও এসআইআর নিয়ে মিথ্যাচারের প্রতিবাদে বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে সাঁইথিয়া চারতলা মোড়ে পরিবর্তন সংকল্প সভা।

তৃণমূল সরকারের খুন-ধর্ষণ-নারী নির্যাতন এবং এসআইআর নিয়ে মিথ্যাচারের প্রতিবাদে কাঁথি মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর হাইস্কুল ময়দানে পরিবর্তন সংকল্প সভায় বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক ও অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।

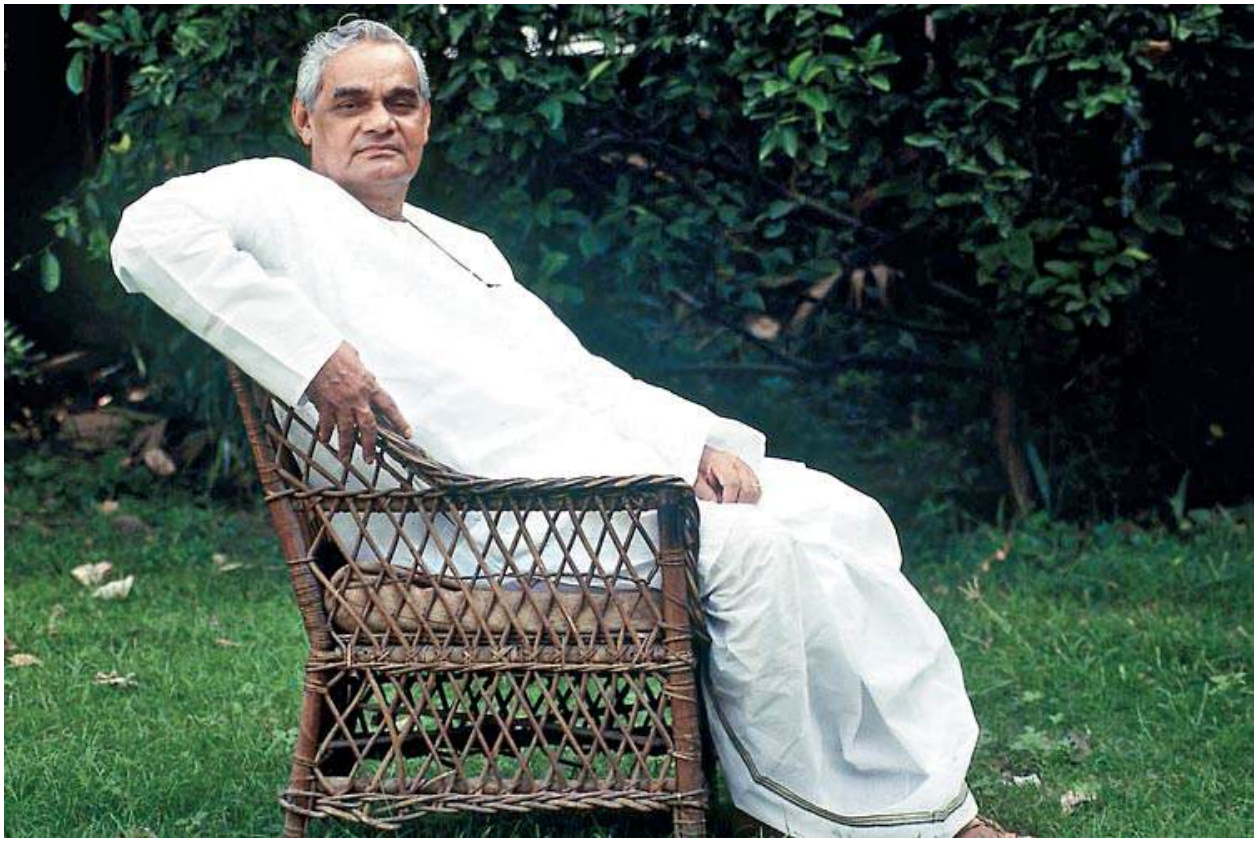

কবি-প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী

বিনয়ভূষণ দাশ

আগ্নেয় পরীক্ষা কি
ইস ঘড়ি মে—
আইয়ে, অর্জুন কি তরহ
উদ্দেঘাষ করে:
“ন দৈন্যং ন পলায়নং”॥ -অটলবিহারী বাজপেয়ী।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে কবি-প্রেসিডেন্টের যুগের কথা বলেছেন; ভারতের ইতিহাসে কোন কবি-প্রেসিডেন্ট আসীন না হলেও স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে একজন কবি-প্রধানমন্ত্রী আসীন হয়েছিলেন। তিনি স্বনামধন্য কবি অটলবিহারী বাজপেয়ী। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, রাজনীতিজ্ঞ, রাষ্ট্রনেতা, বাগ্মী এবং লেখক; একের ভেতরে বহু।

শ্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী জন্মেছিলেন আজকের মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর। তাঁদের আদি নিবাস ছিল আগ্রার নিকটবর্তী যমুনা তীরের বটেশ্বর গ্রামে। তাঁর পিতা কৃষ্ণবিহারী বাজপেয়ী এবং মাতা সুমা (কৃষ্ণা দেবী)। তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য হিসেবে তিনটি 'টার্ম' প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করেছেন।

প্রতিবেশী পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে তিনি আন্তরিক প্রচেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান তাঁদের আজন্ম বৈরিতা থেকে সরে আসতে পারেনি; তারই ফলশ্রুতি হল কার্গিল যুদ্ধ। পাক হানাদারদের প্রতিহত করতে বাজপেয়ী যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে কার্গিল থেকে পাক হানাদারদের প্রত্যাঘাত করে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন।

১৯৯৮-৯৯ সালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মন্দা চললেও তাঁর নেতৃত্বে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি হয় ৫.৮ % যা আগের বৎসরের চেয়েও বেশী ছিল। এছাড়া এই সময়ে কৃষি উৎপাদন এবং বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডারও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। এসবই এগিয়ে চলা অর্থনীতির পরিচায়ক।

এই সম্পর্কে শ্রী বাজপেয়ী মন্তব্য করেছিলেন, "We must grow faster. We simply have no other alternative" । দেশকে স্বনির্ভর করে একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী করে তোলাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। বাহান্নতম স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লা থেকে এক ভাষণে তিনি বলেন, “I have a vision of India: an India free of hunger and fear, an India free of illiteracy and want."

পাঁচ দশকের বেশী সময় ধরে তিনি ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ক্রিয়াশীল ছিলেন। বাজপেয়ীর বাগ্মিতা তাঁকে ভারতীয় জনসঙ্ঘের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির সবচেয়ে বড় রক্ষক হিসেবে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে দলের দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে অর্পিত হয়। ১৯৬৮ সালে তিনি জনসংঘের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি বলরাজ মাধোক, নানাজী দেশমুখ এবং লালকৃষ্ণ আডবানীর সাহায্যে দল পরিচালিত করেন।

তিনি গোয়ালিয়রের ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে স্নাতক এবং তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাঠ সমাপ্ত করেন কানপুরের ডি এ ভি কলেজ থেকে। ১৯৩৯ সালে তিনি বাবাসাহেব আপ্তে দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রাষ্ট্রীয় স্বংসেবক সঙ্ঘে যোগদান করেন। ১৯৪০-৪৪ এর মধ্যে তিনি সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ সমাপ্ত করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি সঙ্ঘের পূর্ণকালীন প্রচারক হন। তাঁকে উত্তরপ্রদেশে বিস্তারক হিসেবে পাঠানো হয়। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হিসেবে হিন্দি সাপ্তাহিক পত্রিকা পাঞ্চজন্য পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন তাঁর পড়াশোনা চলাকালীন অবস্থায়ই। এছাড়া তিনি দীনদয়াল উপাধ্যায় স্থাপিত রাষ্ট্রধর্ম পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেও কাজ করেন। স্বদেশ এবং বীর অর্জুন নামে দুটি পত্রিকার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্ণকালীন প্রচারক ছিলেন। তিনি সঙ্ঘের কাছ থেকে দেশাত্মবোধ এবং নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষালাভ করেন যা পরিবর্তি জীবনে প্রভুত উপকৃত করে। তিনি এবং তাঁর ভাই প্রেম বিহারী বিয়াল্লিশের ভারতছাড় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে জেলে বন্দী ছিলেন।

১৯৫১ সালে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভারতীয় জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাকালে তিনি ভারতীয় জনসঙ্ঘে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ওই সময়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি দলের সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি প্রথম বার লোকসভার সদস্য হিসেবে উত্তরপ্রদেশের বলরামপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন দ্বিতীয় লোকসভায়, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে। এছাড়া তিনি পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম , দশম, একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনিই ভারতে একমাত্র নেতা যিনি ভারতের বিভিন্ন রাজ্য, যেমন উত্তরপ্রদেশ, গুজারাত, দিল্লী এবং মধ্যপ্রদেশ থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হন। উত্তরপ্রদেশের বলরামপুর এবং লখনৌও, মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র এবং নতুন দিল্লী থেকে তিনি বিভিন্ন সময়ে সাংসদ নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৬৮ থেকে ১৯৭২ সাল অবধি অখিল ভারতীয় জনসংঘের সভাপতি ছিলেন। তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনে নয় বার লোকসভা এবং দুই বার রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রথমবার রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরে একবার ১৯৮৬ সালেও রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলি আহমেদ অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা জারী করলে তিনি তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি জরুরী অবস্থা জারী করার পরে পরেই অন্যান্য বিরোধী নেতাদের সাথে গ্রেপ্তার হন এবং তাঁদের জেলে বন্দী রাখা হয়। শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণের ডাকে দেশব্যাপী জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। একদিকে জয়প্রকাশের নেতৃত্ব, অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কুশলী সংগঠনের দ্বারা দেশব্যাপী এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। জন সংঘর্ষ সমিতির ব্যানারে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়। দেশজুড়ে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়। জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় স্বৈরাচারী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার। প্রায় উনিশ মাস পরে তিনি জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন তিনি। একটা কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, দেশের তথাকথিত বিপ্লবের ধজাধারী দুই কম্যুনিস্ট পার্টি জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি।

মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির সাংসদ জ্যোতির্ময় বসু ছাড়া আর কোন গুরুত্বপূর্ণ নেতা গ্রেপ্তার হয়নি, বন্ধু সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের বদান্যতায় জ্যোতি বসুরা নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করেছেন জরুরী অবস্থাকালে। আর সিপিআই তো সরাসরি ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থন করেছিল।

প্রায় উনিশ মাস বাজপেয়ীসহ অন্যান্য নেতাদের

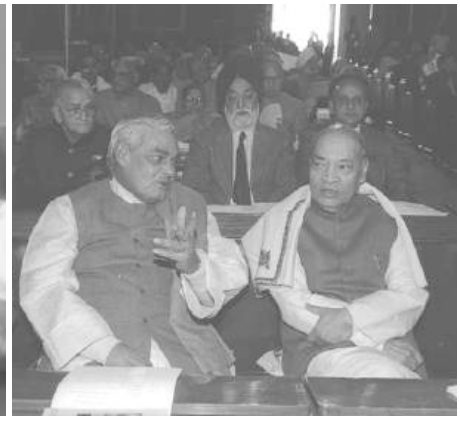

জেলে বন্দী রাখা হয়। জরুরী অবস্থা চলাকালে নাগরিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতা ভীষণভাবে খর্ব করা হয়, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘসহ আরও কয়েকটি সংস্থাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ২১ মার্চ ১৯৭৭ সাল অবধি এই জরুরী অবস্থা স্থায়ী হয়।

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে অভ্যন্তরীণ জারুরী অবস্থার অবসানে শ্রী বাজপেয়ী ও শ্রী আদবানী অন্যান্য কয়েকটি কংগ্রেস বিরোধী দল যথা ভারতীয় লোক দল, সমাজবাদী পার্টি, সংগঠন কংগ্রেস এবং সিএফডি অর্থাৎ কংগ্রেস ফর ডেমোক্রেসি দলের সঙ্গে মিশে জনতা পার্টি গঠন করেন। ১৯৭৭ র নির্বাচনে এই দল অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। জনতা পার্টি মোরারজী দেশাই-এর নেতৃত্বে সেই প্রথম কংগ্রেস বিরোধী দলের সরকার গঠিত হয়। শ্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী সেই সরকারে বিদেশ মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন।

কিন্তু ভূতপূর্ব জনসংঘের দ্বৈত সদস্যতা নিয়ে পার্টির অন্যান্য অংশের বিরোধিতার কারণে জনতা পার্টি ১৯৭৯ সালে ভেঙ্গে যায় এবং সরকারের পতন হয়। ১৯৮০ সালের লোকসভা নির্বাচনে শ্রী বাজপেয়ী নয়াদিল্লি কেন্দ্র থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি পূর্বতন জনসংঘের সদস্যদের নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা গ্রহণ করেন।

জনসংঘের এই বিবর্তনে তিনি ঋত্বিকের ভুমিকা পালন করেন। তিনি পুনর্গঠিত এই নতুন দলের প্রথম সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৮৪ সালে তিনি এবং ভারতীয় জনতা পার্টির বেশীরভাগ নেতা পরাস্ত হন; মাত্র দুজন সদস্য নির্বাচনে জয়ী হন। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নিধন কংগ্রেস দলকে আবেগনির্ভর ভোট পেতে প্রভুত সাহায্য করে। কিন্তু শ্রী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে দল আবার ঘুরে দাঁড়ায়। ১৯৯১ সালে তিনি আবার লোকসভায় নির্বাচিত হন।

১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জনতা পার্টি লোকসভায় সর্ববৃহত্তম দল হিসেবে উঠে আসে। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মা তাঁকে লোকসভায় বৃহত্তম দলের নেতা হিসবে সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। শ্রী বাজপেয়ী ১৯৯৬ সালের মে মাসে প্রথমবারের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই সরকার মাত্র ১৩ দিনের জন্য স্থায়ী হয়। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে বিজেপি আগের চেয়ে বেশী আসনে বিজয়ী হয়, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে সমর্থ হয়নি। ফলে বিজেপি কিছু আঞ্চলিক দলের সঙ্গে একটি নড়বড়ে কোয়ালিশন গঠন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু ১৯৯৯ সালে সেই কোয়ালিশন থেকে এ আই এ ডি এম কে শাসক কোয়ালিশন সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে বাজপেয়ীজি 'ভোট অফ কনফিডেন্স' এ মাত্র ১ ভোটে পরাজিত হয়ে পদত্যাগ করেন। এই সরকার ১৩ মাসের জন্য স্থায়ী হয়। যদিও সেই বৎসরে অনুষ্ঠিত লোকসভার সাধারণ নির্বাচনে শ্রী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে এনডিএ আসন বাড়িয়ে নেয় এবং সরকার গঠন করে এবং সেই সরকার ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ অবধি পূর্ণ সময় দেশ শাসন করে। তিনিই প্রথম কোনও অকংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী যিনি পূর্ণ সময় শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

২০০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের কাজেও নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। বিভিন্ন সংসদীয় সমিতির সদস্য হিসেবেও তিনি উল্লেখ্যোগ্য কাজ করেছেন। ১৯৭৭ সালে তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের সভায় ভারতীয় ভাষা হিন্দিতে ভাষণ দান করেন যা রাষ্ট্রসঙ্ঘের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত হন। ১৯৯৪ সালে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সাংসদ সম্মানে ভূষিত হন। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারতরত্ন সম্মানে সম্মানিত হন। ওই একই বৎসরে তিনি বাংলাদেশের 'ফ্রেন্ড অফ বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার' সম্মানে সম্মানপ্রাপ্ত হন। ১৯৯৩ সালে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি লিট উপাধিতে ভূষিত করে।

তিনি ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট ৯৩ বৎসর বয়সে দেহান্তরিত হন।

তাঁর জন্মদিন ২৫ শে ডিসেম্বর সুশাসন দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে শ্রী বাজপেয়ী একজন কবি, হিন্দু জাতীয়তাবাদী অথচ বাস্তববাদী, উদার রাষ্ট্রনেতা নেতা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

ভারত–রাশিয়া সম্পর্কের নবযাত্রা

বাজপেয়ীর কৌশলগত বাস্তববাদ থেকে মোদীর বহুমুখী অংশীদারিত্ব

অনিকেত মহাপাত্র

বাজপেয়ীর আমলে যে পারস্পরিক আস্থার ভিত্তি রচিত হয়েছিল, মোদীর আমলে তা কার্যত পরীক্ষিত ও দৃঢ়তর হয়; প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র যৌথ উৎপাদন, এই সম্পর্কের প্রতীক হয়ে ওঠে, যা শুধু একটি অস্ত্র প্রকল্প নয়, বরং ভারত–রাশিয়ার প্রযুক্তিগত আস্থা ও কৌশলগত গভীরতার মূর্ত প্রকাশ।

সামাজিক মাধ্যমে একটি দোচালা ছবি ঘুরে বেড়াচ্ছিল দিন কয়েক জুড়ে। প্রথম ফ্রেমে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী ও রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান শ্রী ভ্লাদিমির পুতিন। শ্রী বাজপেয়ীর পেছনে শ্রী নরেন্দ্র মোদি। দ্বিতীয় ফ্রেমে সদ্য ভারত সফরকালীন মোদি ও পুতিন। এই দোচালা চিত্র অনেক কথা বলে দেয় যা কয়েক হাজার শব্দও বলতে অক্ষম। আমাদের লেখার অভিমুখও বোধহয় স্থির করে দেয়।

ভারত-রাশিয়া এই দুটি দেশ একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আছে অনেকটা একই জায়গায়। তাদের প্রতিবেশী দেশে আছে দুই ক্ষমতালোভী জোকার; যারা পশ্চিমা অন্ধকারের (ডিপ স্টেট) দ্বারা পুষ্ট ও বলিষ্ঠ।

রাশিয়া সফরে অটল বিহারী বাজপেয়ী ২০০১।

একটি দেশের ফ্রন্টে লড়াই চলেছে; আর একটি দেশে শুধুমাত্র ধৈর্য্যের ও সহনশীলতার কারণে ফ্রন্ট এখনও ঘোষিতভাবে যুদ্ধের পর্যায়ভুক্ত নয়। পাশের জেহাদি ও জোকার রাষ্ট্র থেকে যে ধরনের প্ররোচনা আসছে তাতে স্থির থাকার প্রেরণা অন্যকিছু নয় আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি দিয়েছে, নচেৎ ভয়ানক কিছু হতে পারত। বিজাতীয় কিছুর অবস্থান থাকলে পরিস্থিতি হত অন্যরকম।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সদ্য সমাপ্ত ভারত সফরের প্রেক্ষিতে ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের নতুন দিগন্তের প্রসঙ্গ চলে আসে। যার সূচনা হয়েছিল সোভিয়েত পরবর্তী সময়ে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে। আর তা পূর্ণতা প্রাপ্তির সার্বিক দিশা পেল বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমলে।

পাকিস্তান হল ভারতীয় উপমহাদেশের ক্ষেত্রে একটি দুঃসহ পরিহাস। আর বাংলাদেশ হল তার বিকৃত প্রতিধ্বনি। ভারত তার স্বাভাবিক শুভেচ্ছা নিয়ে বাংলাদেশের সৃষ্টির প্রচেষ্টায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল তার এই কাজের সক্রিয় সমর্থনকারী। কিন্তু ইতিহাসের অদ্ভুত বিদ্রুপ হয়ে এটি সম্ভাব্যরূপে একটি শত্রু রাষ্ট্রের রূপ নিয়েছে। ডাইরেক্ট একশন কিংবা নোয়াখালির হিন্দু গণহত্যার প্রেরণাই এদের রাষ্ট্রীয় স্পন্দন।

সে যাই হোক মোদ্দা কথা এই যে, আমরা বলতে পারি সোভিয়েত-পরবর্তী সময়ে অটলবিহারী বাজপেয়ীর কার্যকালে ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের মধ্যে যথার্থ বাস্তববাদী ভিত্তির সূত্রপাত হল। যার বৃহত্তর রূপায়ণ সম্ভবপর হল নরেন্দ্র মোদীর আমলে।

ভারত– রাশিয়া সম্পর্ক আন্তর্জাতিক রাজনীতির এমন একটি অধ্যায়, যা কেবল কূটনৈতিক সমীকরণ নয়, বরং ইতিহাস, পারস্পরিক আস্থা ও কৌশলগত বাস্তববাদের দীর্ঘ ধারাবাহিকতা। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর নব্বইয়ের দশকে যখন বিশ্ব একমেরু ব্যবস্থার দিকে এগোচ্ছিল, তখন বহু পর্যবেক্ষকই ধারণা করেছিলেন যে ভারত–রাশিয়া সম্পর্ক দুর্বল হবে, কিন্তু এই ধারণাকে বাস্তবতায় ভুল প্রমাণ করেন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। যিনি ১৯৯৮ সালের পরমাণু পরীক্ষার পর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার মুখে দাঁড়িয়েও রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ককে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেন; বাজপেয়ীর নেতৃত্বে ভারত ও রাশিয়া "বিশেষ ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত কৌশলগত অংশীদারিত্ব" স্থাপন করে, যা ছিল সোভিয়েত-পরবর্তী যুগে সম্পর্কের ভিত্তিপ্রস্তর, এই পর্যায়ে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, সামরিক প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং বহুপাক্ষিক বিশ্বব্যবস্থায় ভারত– রাশিয়ার অভিন্ন অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে বাজপেয়ী বুঝেছিলেন যে রাশিয়াকে কেবল অস্ত্র সরবরাহকারী হিসেবে নয়, বরং একটি ভারসাম্য রক্ষাকারী বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে দেখা প্রয়োজন, যার সঙ্গে ভারতের স্বার্থ আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া এবং চিনের উত্থানের প্রেক্ষিতে গভীরভাবে যুক্ত। এই বাস্তববাদী ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির উত্তরাধিকার বহন করেন পরবর্তী সরকারগুলিও। তবে নরেন্দ্র মোদীর আমলে ভারত–রাশিয়া সম্পর্ক এক নতুন মাত্রা লাভ করে, যেখানে ঐতিহ্যগত প্রতিরক্ষা সহযোগিতার বাইরে অর্থনীতি, শক্তি, আর্কটিক অঞ্চল, মহাকাশ গবেষণা এবং বহুমুখী কূটনীতির ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়। মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই পরিষ্কার করে দেয় যে ভারত কারও ব্লকে বাঁধা থাকবে না, বরং "মাল্টি-অ্যালাইনমেন্ট" নীতির মাধ্যমে সব প্রধান শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে, এই নীতির আওতায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক যতই ঘনিষ্ঠ হোক না কেন, রাশিয়ার সঙ্গে ঐতিহাসিক কৌশলগত সম্পর্ককে কোনওভাবেই দুর্বল হতে

দেওয়া হবে না; ইউক্রেন যুদ্ধের পর এই অবস্থান আরও স্পষ্ট হয়, যখন পশ্চিমা চাপ সত্ত্বেও ভারত রাশিয়ার সঙ্গে শক্তি ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখে, রুশ তেল আমদানিতে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে এবং ভারত নিজেকে উন্নয়নশীল বিশ্বের কণ্ঠস্বর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে --যারা কূটনীতিকে নৈতিক বক্তৃতার বদলে জাতীয় স্বার্থের নিরিখে বিচার করে; বাজপেয়ীর আমলে যে পারস্পরিক আস্থার ভিত্তি রচিত হয়েছিল, মোদীর আমলে তা কার্যত পরীক্ষিত ও দৃঢ়তর হয়; প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র যৌথ উৎপাদন, এই সম্পর্কের প্রতীক হয়ে ওঠে, যা শুধু একটি অস্ত্র প্রকল্প নয়, বরং ভারত–রাশিয়ার প্রযুক্তিগত আস্থা ও কৌশলগত গভীরতার মূর্ত প্রকাশ। পাশাপাশি পারমাণবিক শক্তিতে কুদানকুলাম বিদ্যুৎ প্রকল্প ভারতের শক্তি নিরাপত্তায় রাশিয়ার দীর্ঘমেয়াদি ভূমিকা নিশ্চিত করে; মোদী যুগে ভারত–রাশিয়া সম্পর্কের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বহুপাক্ষিক কূটনীতিতে সমন্বয়, ব্রিকস, সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন এবং জি-২০–এর মতো মঞ্চে উভয় দেশই পশ্চিমকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার একচেটিয়া দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে বহুমেরু ব্যবস্থার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। যেখানে ভারতের আত্মবিশ্বাসী উত্থান ও রাশিয়ার ভূ-কৌশলগত অভিজ্ঞতা পরস্পরকে পরিপূরক করে; বাজপেয়ীর সময়ে যেখানে মূল লক্ষ্য ছিল সম্পর্ক রক্ষা ও পুনর্গঠন, মোদীর সময়ে সেখানে লক্ষ্য হয়েছে রূপান্তর ও বৈচিত্র্য, ফলে ভারত–রাশিয়া সম্পর্ককে আর কেবল সামরিক সহযোগিতায় সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি; রাশিয়ার দূরপ্রাচ্য অঞ্চলে ভারতীয় বিনিয়োগ, চেন্নাই– ভ্লাদিভস্তক সমুদ্রপথের সম্ভাবনা, আর্কটিক অঞ্চলে শক্তি সহযোগিতা এবং ডিজিটাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিনিময় এই সম্পর্কের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। তবু এটিও সত্য যে চিন– রাশিয়া ঘনিষ্ঠতার ফলে ভারত–রাশিয়া সম্পর্কে কিছু জটিলতা তৈরি হয়েছে, কিন্তু এখানেই মোদী কূটনীতির বাস্তববাদ স্পষ্ট, ভারত জানে যে রাশিয়াকে সম্পূর্ণভাবে চিনের দিকে ঠেলে দেওয়া তার স্বার্থের পরিপন্থী, তাই নিয়মিত শীর্ষ বৈঠক, নিরাপত্তা সংলাপ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার মাধ্যমে এই সম্পর্ক সক্রিয় রাখা হয়েছে। বাজপেয়ী থেকে মোদী— এই সময়কাল ভারত– রাশিয়া সম্পর্কের এক ধারাবাহিক বিবর্তনের ইতিহাস, যেখানে আদর্শ নয় বরং জাতীয় স্বার্থ, স্মৃতি নয় বরং কৌশল এবং আবেগের বদলে বাস্তববোধ প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমান বৈশ্বিক অস্থিরতার যুগে ভারত– রাশিয়া সম্পর্ক কোনও অতীতের অবশেষ নয়, বরং ভবিষ্যৎমুখী সমীকরণ, যা উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য এক বিকল্প কূটনৈতিক পথের দিশা দেখায়। বাজপেয়ীর ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টি ও মোদীর রাজনৈতিক মেধা এবং সক্রিয় কূটনীতির সমন্বয়ে এই সম্পর্ক এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। যেখানে ভারত স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বজায় রেখে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক রাখছে এবং একই সঙ্গে বিশ্বের সঙ্গে তার নিজের ভূমিকা পুনর্নির্মাণ করছে— এটাই ভারত– রাশিয়া সম্পর্কের প্রকৃত সাফল্য।

লেখাটি শেষ করা যেতে পারে প্রোলেপ্সিস পদ্ধতিতে; গত শতাব্দীর নয় দশকে ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। হওয়াই স্বাভাবিক

অটল ও অটুট বন্ধুত্ব।

পুতিনকে মোদীর গীতা উপহার।

কারণ ১৯৪৭-এর পর তো সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল। এই সম্পর্ককে যদি ২০৪৭ কিংবা ২০৫০ অবধি টানা যায় তবে কী দাঁড়াতে পারে। এখন লক্ষ্য আফ্রিকা! রাশিয়া নিজের কাইনেটিক প্রেজেন্স বাড়াচ্ছে আফ্রিকায়। আর ভারত বাড়াচ্ছে আর্থিক, সামাজিক আর সাংস্কৃতিক উপস্থিতি। ইতিমধ্যে চিনা ঋনের ট্র্যাপ নিয়ে বিশ্বে সবাই সন্দিহান। আর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ সম্ভবত শেষ হওয়ার মুখে। জেলেনস্কি মুখ বাঁচানোর পথ খুঁজছেন আবার কখনও কখনও ইউরোর আশায় চেগে উঠছেন। নতুন করে মার্কিনি ডলার আসার সম্ভাবনা খুব কম। ট্রাম্প এবং তাঁর পুরো পরিবার (জামাতা কুশনার,জ্যেষ্ঠ পুত্র জুনিয়র ট্রাম্প প্রমুখ) উঠে পড়ে লেগেছে জেলেনস্কি কিংবা ইউক্রেনের পেছনে। এই অধ্যায় সমাপ্ত হলে মার্কিনিরা শুরু করবে চিনের পেছনে পড়া। তাদের জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত দস্তাবেজে চিনকে সর্বাধিক শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্র বলে আবারও একবার দাগিয়ে দিয়েছে তারা। অন্যদিকে জাপানের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ও ডাকাবুকো রাষ্ট্রনেত্রী সানায়ে তাকাইচি তাইওয়ান ইস্যুতে চিনের বিরুদ্ধে যথেষ্ট আক্রমণাত্মক যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময়ের জাপানের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। আবার আমাদের রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বিষয়ে গবেষণা ও বিশ্লেষণ-এর কাজটা যাঁরা দেখেন তাঁরা রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের সদ্য সমাপ্ত সফরের সময় তাঁর বডি ল্যাংগুয়েজ নিয়ে একটি বিশ্লেষণ প্রধানমন্ত্রীর দফতরে জমা দিয়েছিলেন। সেখানে দেখা গেছে প্রায় ক্লোজ ডোর বৈঠকের সময় যে প্রসঙ্গ বা যে নামে পুতিনের গলায় স্বরের স্বাভাবিক ছন্দ ব্যাহত হয়েছে, কিংবা 'ওয়ার্ম' ব্যাপারটা উধাও হয়ে গেছে তা হল 'চিন'। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ফিরিয়ে আনতে চান সেই সোভিয়েতকালীন গৌরব, তিনি কী করে পারবেন চিনের জুনিয়র পার্টনার হতে। ঠিক যেমন করে ভারতের পক্ষে সম্ভব নয় দীর্ঘকালীন প্রেক্ষিতে এশিয়ায় চিনের পার্টনার হওয়া। ইতোমধ্যে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে 'রেলোস' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। একে অন্যের সামরিক সহ অন্যান্য ঘাঁটি অবলীলায় ব্যবহার করতে পারবে। ইন্দো-প্যাসিফিকে আসতে পারবে রাশিয়া। ভারত যাবে আর্কটিক, এশিয়া সংযুক্ত রাশিয়ায়। খেলার ময়দান এখন সারা বিশ্বে উন্মুক্ত ভারতের জন্য ভারত-রাশিয়ার এক রেয়ার কম্বিনেশনে। সামনের দশক অনেক কিছু দেখবে। আপনারা যতই নিন্দে মন্দ করুন, আড়ালে হাসছে ট্রাম্প। সে-ই তো অনেক বাধা কাটিয়ে দিল। বাইডেন কিংবা ওবামা থাকলে কস্মিনকালেও সম্ভব হত না 'রেলোস' স্বাক্ষরিত হওয়া। ট্রাম্প দ্য লিবারেটার!

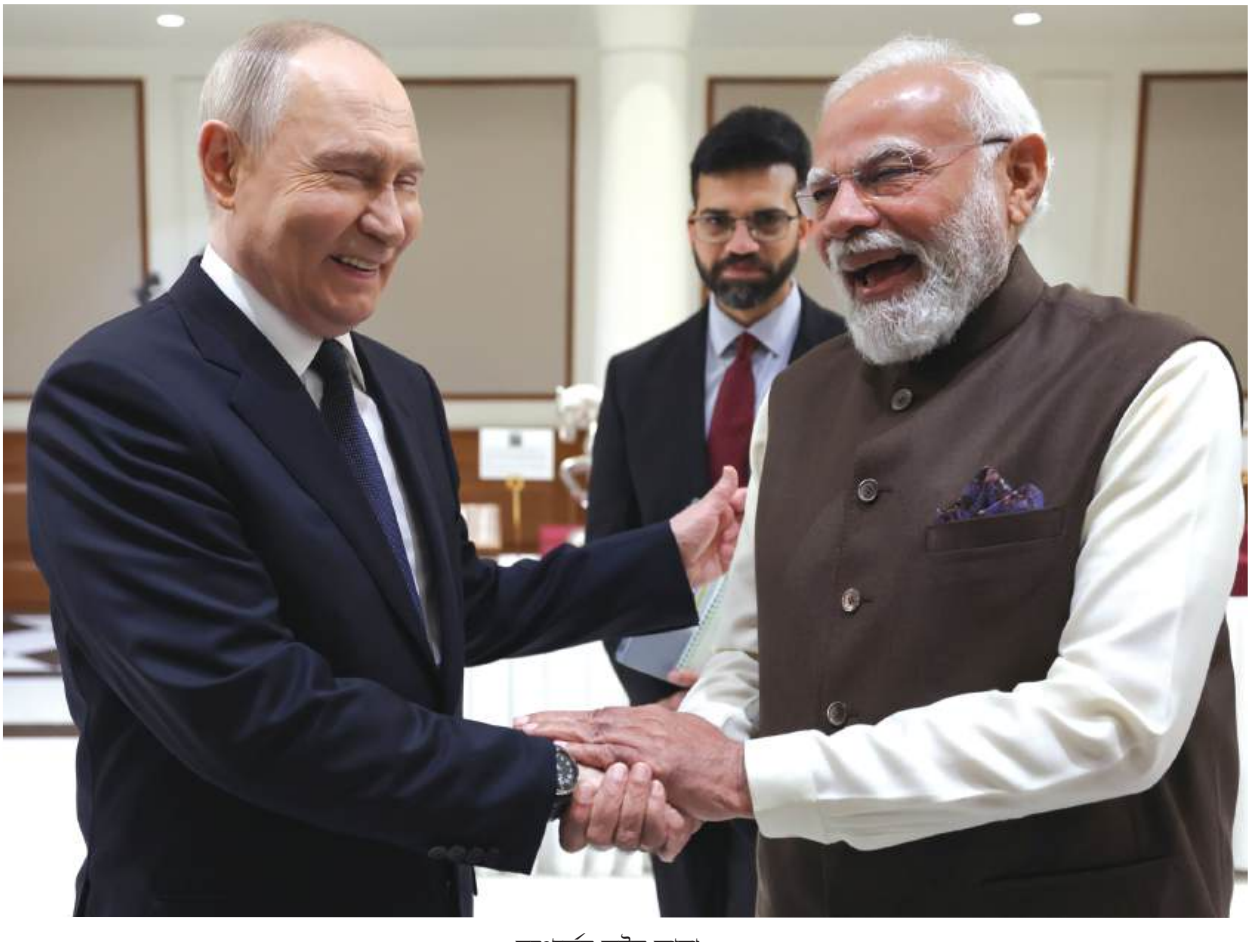

সম্পর্কের অটল আস্থা।

আদিনা মসজিদ নয়
ওটা আদিনাথ মন্দির

অভিরূপ ঘোষ

"কোনও মন্দির-মসজিদের লড়াই নয়। কোনও হিন্দু-মুসলমানের বিভাজনের বিষয় নয়। কিন্তু, কী ঘটেছিল? মালদা জেলার পাণ্ডুয়ায় ব্রিটিশদের গুলিতে প্রাণ দিয়েছিলেন জিতু সান্থাল। ওঁর লক্ষ্য এটাই ছিল যে, 'সন্ন্যাসী দল'-এর সাহায্যে আদিনাথ মন্দির পুনরুদ্ধার করবেন। আর আজ কী হচ্ছে!"

মুর্শিদাবাদে দাঁড়িয়ে হুমায়ূন বলছে বাবরি মসজিদের কথা। মানে তৃণমূল বলাচ্ছে তাদের মুখোশ হুমায়ূনকে দিয়ে। এই মুখোশকে আবার সমালোচনা করছে তৃণমূলের আর এক মুখোশ, ফিরহাদ হাকিম। যিনি প্রকাশ্যে বলেছিলেন, "যারা দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে, তাদের ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে!" এদের দুজনের পিছনে আসলে যে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রশ্রয়েই তো ২০২৫ সালের অক্টোবরে মালদার আদি নাথ মন্দিরে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের 'বহিরাগত খোকা' সাংসদ ইউসুফ পাঠান সমাজমাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে বলেছিল, "আদিনা মসজিদ ১৪শ শতকে ইলিয়াস শাহি বংশের দ্বিতীয় শাসক সুলতান সিকন্দর শাহ নির্মাণ করেছিলেন। তখন এটি ছিল উপমহাদেশের বৃহত্তম মসজিদ।" সাহস পায় কোথা থেকে আদি নাথ মন্দিরকে আদিনা মসজিদ বলার। সাহসের সূত্র সব এক। মানুষরুপী মানুষের এক কলঙ্ক। হিন্দু বিরোধী, সনাতন বিরোধী এক বিরল প্রজাতি যার একমাত্র লক্ষ্য পশ্চিম বাংলাকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানানো।

মুসলমান শাসকদের আমলে গোটা দেশের সঙ্গে আমাদের এই বাংলাতেও, কোলকাতা এবং কলকাতার আশেপাশে অনেক জায়গায় মন্দিরের ধ্বংসস্তুপ আজও মেলে। তাদের অনেকগুলোই যে প্রকৃতির বদলে মানুষের হাতেই খুন হয়েছিল সেটা অনস্বীকার্য। কয়েকটিকে শুধু ধ্বংস করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল আর কয়েকটিকে ধ্বংস করে হামলাকারীরা গড়ে নিয়েছিল নিজেদের পছন্দের ধর্মস্থান। যেমন ধরুন মালদার জেলার পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদ। কিছু ঐতিহাসিকের মতে বাংলা তথা ভারতের অন্যতম বৃহৎ এবং সুপ্রাচীন আদিনা মসজিদ আদতে হিন্দু 'আদিনাথ' মন্দির। মনে করা হয় 'আদিনাথ' নাম থেকেই 'আদিনা' নামের উৎপত্তি। এই স্থাপত্যের গঠনশৈলী এবং উত্তর ও পূর্বদ্বার সমেত দেওয়ালের বিভিন্ন অংশে হিন্দু বাস্তুশাস্ত্র ও রীতিনীতির বেশ কিছু নিদর্শন দেখে অনেক ঐতিহাসিক এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে

চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সিকন্দর শাহ এক বিশাল শিব এবং বিষ্ণুমন্দির ধ্বংস করে সেই ধ্বংসস্তুপের উপর তৈরি করেছিলেন আদিনা মসজিদ। মসজিদের মধ্যে গণেশ আর নটরাজের মূর্তি খোদাই করা পাথর ও মাটি থেকে প্রায় পনেরো ফুট উচ্চতা অব্দি স্লেট পাথরের দেওয়াল (বাকিটা অন্যভাবে তৈরি) এই সম্ভাবনার বারুদে আগুন দিয়েছে। স্থাপত্যের জায়গায় জায়গায় হিন্দু দেবদেবীর ন্যায় খোদাই করা মূর্তি এবং মসজিদ চত্বরে প্রবেশের মুখে সরকারি বর্ণনামূলক বোর্ড (যার শেষ লাইনে লেখা, 'মসজিদে ব্যবহৃত সুবিন্যস্ত প্রস্তরখন্ডগুলি আংশিকভাবে পূর্ব-স্থাপত্য কীর্তি হইতে সংগৃহীত') কারুর মনে এ বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে বাধ্য। তবে একথা একশো শতাংশ সত্যি যে মন্দির ভেঙ্গে আদিনা মসজিদ গড়ার কোনো ঐতিহাসিক পোক্ত প্রমান আজও উপলব্ধ নেই। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ বলছে, মসজিদ তৈরির সময় পাল–সেন যুগের মন্দিরগুলির ভাঙা পাথর ও খোদাই করা স্তম্ভ ব্যবহার করা হয়েছিল। দেওয়াল ও খিলানের অলঙ্করণে দেখা যায় ফুল, ঘন্টা, মালা, মুখমণ্ডল ও কৈলাস প্রতীকের মতো মোটিফ। যেগুলি মূলত হিন্দু স্থাপত্যে ব্যবহৃত হত। একাধিক গবেষকই মনে করেন, এই মসজিদের মূল কাঠামোটি এক সময় শিবের মন্দির ছিল, যেখানে দেবতার রূপ ছিল 'আদিনাথ' অর্থাৎ 'প্রথম দেব'।

মসজিদে সিংহের মাথা!

২০২৪ সালে আইনজীবী হরিশঙ্কর জৈন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখে আদিনা মসজিদে পুজো শুরু করার অনুমতি চেয়েছিলেন। তাঁর দাবি ছিল, "সিকন্দর শাহ হিন্দু মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরি করেছিলেন। এখন সময় এসেছে ইতিহাসের সেই ভুল ঠিক করার।" ২০২৪ সালে হিন্দু সংগঠনের একাংশ ওই স্থানে গিয়ে পুজো করতেও চেষ্টা করে। তরুণ পুরোহিত হিরণ্ময় গোস্বামী ও তাঁর অনুসারীরা মসজিদের ভিতরে শিবলিঙ্গও দেখতে পান বলে দাবি করেন। যদিও প্রশাসনের হস্তক্ষেপে ওই পুজো বন্ধ করা হয়। কেন বন্ধ হল? যে দলের নেত্রী দুর্গা মন্দির করার কথা ঘোষণা করেন নির্বাচনের আগে (ঠ্যালায় পড়ে), তার একবারও মনে হলনা আদিনাথ মন্দিরকে স্বমহিমায় ফিরিয়ে দিতে! তবে যে ধর্ম তার কাছে 'গন্দা ধর্ম', সেই ধর্মের দেবাদিদেবের জন্য তিনি কেনই বা উৎসাহিত হবেন! ধর্মের কথা যদি ছেড়েও দিই তাহলেও প্রশ্ন উঠবে। উঠবেই প্রশ্ন। পান্ডুয়ার আদিনাথ মন্দির তো বাংলা ও বাঙালীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ভারতীয় সংস্কৃতির চিরায়ত ঐতিহ্য। তো বাংলা-বাঙালী এবং ভারতীয় সংস্কৃতি নিয়ে তার এই অবহেলা কেন? কাদের স্বার্থ তিনি রক্ষা করতে চান? পশ্চিমবঙ্গের ভারতীয় বাঙালী নাকি বাংলাদেশী বাংলায় কথা বলা অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের!

মসজিদে গণেশ মূর্তি?

আসলে তৃণমূলের হুমায়ূন-শাহজাহান-ফিরহাদ-ইউসুফরা বারবার আমাদের সংস্কৃতিকে আক্রমণ করছে। আক্রমণ করানো হচ্ছে সুপরিকল্পিতভাবে। যেমনটা ক্ষমতা ধরে রাখতে ব্যবহার করেছিল ইসলামিক শাসকরা। ক্ষমতায় টিকে থাকতে ওরা প্রথমেই টার্গেট করতো কালচারকে। অবশ্যম্ভাবীভাবে মিটিয়ে দেওয়া হত সংস্কৃতির পুরানো নিশানগুলিকে। তারপর আক্রমন নেমে আসতো শিক্ষাব্যবস্থা আর শাসনকাঠামোয়। সবশেষে শুরু হত 'মাস কনভার্সন'। এটা খুব চেনা একটা ফর্মুলা। এই যেমন রাজ্যের শাসক দলকেই দেখে নিন। কঠিনতম একটা লড়াই জিতে প্রথমে যে কাজটা করেছিলেন মাননীয়া তা হল চেনা রাইটার্সের বদলে নতুন নবান্নে নিজের সদর দপ্তর সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। সাথে সাথেই বামেদের অহংকারের লাল রং মুছে নীল-সাদায় মুড়ে দেওয়া হল রাজ্যকে। সৌন্দর্যায়ন মুখের শব্দ। আসলে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হল পুরানো সংস্কৃতিকে। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যপক রদবদল আর দল পরিবর্তন যথাক্রমে পরের দুটো ধাপ।

আসলে এটা খুব পুরানো এবং কার্যকরী পদ্ধতি। আজ থেকে বহু বছর আগে যখন মধ্যপ্রাচ্যের বিদেশি শক্তিরা দখল নিতে শুরু করে উপমহাদেশের, তারাও এই একই পদ্ধতি অবলম্বন করতো মূলগতভাবে।

হিন্দুদের (যদিও শঙ্করাচার্য পূর্ববর্তী সময়ে এবং পরবর্তী বেশ একটা লম্বা ব্যবধানে হিন্দুধর্ম দানা বাঁধেনি সেভাবে। 'হিন্দু' বলতে মূলত তাই শক্তির উপাসক এবং বৌদ্ধ ব্যাতিত আর যারা মূর্তিপুজায় ঈশ্বরসাধনা করতো তাদের বোঝানো হয়েছে আর হবে) মন্দির আর বৌদ্ধদের মঠ বরাবর ছিল ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিদেশি শত্রুর আক্রমনে তাই প্রাথমিক টার্গেট হল ওগুলোই।

খুব সম্ভবত এই আক্রমনের প্রথম শিকার হিন্দুদের সূর্য মন্দিরগুলো। সময়টা খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতক। উপমহাদেশে তখন হিন্দু আর বৌদ্ধদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। হিন্দুরা মূলত শক্তির উপাসনা করতো, তাই সমস্ত শক্তির উৎস 'সূর্য' তখন তাদের প্রধানতম উপাস্য দেবতা। ঠিক এই সময়ে বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশের মুলতানে এক অসামান্য সূর্য মন্দিরের উপস্থিতির বর্ণনা পাওয়া যায়

এ তো মন্দির স্থাপত্য!

চৈনিক পর্যটক হিউ-এন-সাংয়ের বর্ণনায়। তাঁর কথায় বিশালাকার এক মন্দিরের মাঝে ছিল সোনার তৈরি এক সুবিশাল সূর্য মূর্তি যাতে খোদাই করা ছিল মহামূল্যবান সব মণি-রত্ন। সারা ভারত থেকে তখন লোক আসতো এই মন্দিরে আর শুধুমাত্র এই মূর্তির জন্যেই মধ্যপ্রাচ্যের লোকেরা মুলতানকে ডাকতো 'সোনার শহর' বলে।

মুলতান সূর্য মন্দিরে প্রথম আক্রমন করেন মির কাসেম। কাসেমের আক্রমণের প্রায় দু'শতক পর, ৯৮৬ সালে শিয়া শাসকদের আক্রমনে মাটিতে মিশে যায় মুলতানের সূর্য মন্দির। হিন্দুরা আবারও তৈরি করলো ওই মন্দির। পুজোও হতে থাকলো। কিন্তু ফাইনালি ঔরঙ্গজেবের আদেশে সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে ফুলস্টপ পড়ে যায় মুলতান সূর্য মন্দিরের ইতিহাসে। মুলতানের সূর্য মন্দিরের মতো একই পরিনতি হয়েছিল বর্তমান জম্মু-কাশ্মিরের মার্তণ্ড সূর্য মন্দির এবং গুজরাটের মধেরা সূর্য মন্দির, রুদ্র মহালয়া মন্দির এবং সোমনাথ মন্দিরের। জনশ্রুতি যে সোমনাথ মন্দির মোট ধ্বংস করা হয়েছে সতেরো বার। মাহমুদ গজনি (১০২৬ সাল) থেকে আরম্ভ করে আফজল খান (আলাউদ্দিন খিলজির সেনাপতি) হয়ে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত কে নেই সেই তালিকায়! প্রতিবার আক্রমনে শুধু যে লুট আর ধ্বংসলীলা চালিয়ে ক্ষান্ত মুসলিম শাসকরা তাই নয়, শোনা যায় একই সাথে মেরে ফেলা হয়েছে হাজার হাজার পুরোহিত আর ভক্তকে।

কাশীতে ঔরঙ্গজেব মন্দির ধ্বংস করে নির্মাণ করেছিলেন জ্ঞানবাপি মসজিদ। পরবর্তীতে অষ্টাদশ শতকে আহিল্যাবাই হোলকারের তৈরি মন্দির, যা বর্তমানে হিন্দুদের পুণ্যতীর্থ হিসাবে গন্য হয়, তা মসজিদের ঠিক পাশেই। ঠিক একই ভাবে মালদার পান্ডুয়ায় আদিনাথ মন্দির ভেঙ্গে তৈরি হয়েছিল আদিনা মসজিদ। আর সেই মন্দির পুনরুদ্ধারের জন্য ব্রিটিশের গুলিতে প্রাণ গিয়েছিল জিতু সান্থালের।

কাশীতে ঔরঙ্গজেব মন্দির ধ্বংস করে নির্মাণ করেছিলেন জ্ঞানবাপি মসজিদ। পরবর্তীতে অষ্টাদশ শতকে আহিল্যাবাই হোলকারের তৈরি মন্দির, যা বর্তমানে হিন্দুদের পুণ্যতীর্থ হিসাবে গন্য হয়, তা মসজিদের ঠিক পাশেই। ঠিক একই ভাবে মালদার পান্ডুয়ায় আদিনাথ মন্দির ভেঙ্গে তৈরি হয়েছিল আদিনা মসজিদ। আর সেই মন্দির পুনরুদ্ধারের জন্য ব্রিটিশের গুলিতে প্রাণ গিয়েছিল জিতু সান্থালের।

রাখঢাক না করে সংসদের শীতকালীন

অধিবেশনে আদিনাথ মন্দির নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সাংসদ এবং বিজেপি রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য। ঐতিহাসিক তথ্য সহকারে সংসদে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, "কোনও মন্দির-মসজিদের লড়াই নয়। কোনও হিন্দু-মুসলমানের বিভাজনের বিষয় নয়। কিন্তু, কী ঘটেছিল? মালদা জেলার পাণ্ডুয়ায় ব্রিটিশদের গুলিতে প্রাণ দিয়েছিলেন জিতু সান্থাল। ওঁর লক্ষ্য এটাই ছিল যে, 'সন্ন্যাসী দল'-এর সাহায্যে আদিনাথ মন্দির পুনরুদ্ধার করবেন। আর আজ কী হচ্ছে! এটা ঐতিহাসিক তথ্য, প্রখ্যাত ওরিয়েন্টালিস্ট (প্রাচ্যবিদ) জে ডি বিগলার, মালদার কালেক্টর জে এইচ রবিন শাহ ১৮৬৫ থেকে ১৮৬৭ সালে তাঁরা...বিভিন্ন ধরনের প্রমাণ নথিভুক্ত করেছিলেন, যে তথ্য দাবি করে যে সেখানে হিন্দু মন্দির ছিল। ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, ওখানে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের উপাদান রয়েছে। এই ভাবে কতদিন চলতে পারে! আমরা ইতিহাসকে মুছে দিতে পারি না। আমরা আমাদের রীতি-নীতি, সংস্কারকে ত্যাগ করতে পারি না। কিন্তু, এটাই পশ্চিমবঙ্গে হয়ে আসছে। এখন সেখানে 'বাবরি মসজিদ' তৈরি করার তোড়জোড় চলছে। আর আদিনা মসজিদ নয়, ওটা আদিনাথ মন্দির। এর ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে। ASI-এর নথি রয়েছে। সেটির উপর গবেষণা হওয়া উচিত। সমস্ত হিন্দু সংস্কৃতির প্রমাণ রয়েছে। পদ্মফুল, যোনিপীঠ, শিবলিঙ্গ, লক্ষ্মী ঠাকুরের হাত,সব মুছে ফেলা হচ্ছে। সেটা বন্ধ করা উচিত। সরকারের কাছে আমাদের আর্জি, সেটাকে রক্ষা করা উচিত।"

মসজিদের দেওয়ালে নাগ দেব!

আসলে ভোট বড় বালাই। হয়তো তাই এই আধুনিক সময়ে এসেও শেষ মাত্র কয়েক বছরে আমাদের এই রাজ্যেই হাওড়া (হনুমান মন্দির), রামপুরহাট (দক্ষিনা কালি মন্দির), ক্যানিং (দেবী বনবিবি মন্দির), মগরাহাট (কালি মন্দির) থেকে ডায়মন্ডহারবার (কালি মন্দির) অব্দি বিভিন্ন জায়গায় একের পর এক ধর্মীয় আক্রমন সংগঠিত হলেও সরকার বাধ্য হয় চোখ বন্ধ করে বসে থাকতে। কেন? কিসের জন্য? মুখোশের আড়ালে যে মুখ তিনি কি আসলে ভারতীয় বাঙালী ও বাংলার বিশ্বাস-সংস্কৃতিকে মুছে দিয়ে তার ওপরে বাংলাদেশী রোহিঙ্গা সংস্কৃতিকে নির্মাণ করতে চান?

আসন্ন সেই সময়। এবারের নির্বাচন, হিন্দুবিরোধীদের বিসর্জন। তৃণমূলের বিসর্জন। বাংলায় মুসলিম লিগের বিসর্জন। বাংলা ও ভারতীয় বাঙালী বিরোধীদের বিসর্জন।

পদ্মের মোটিফ, শিবলিঙ্গের অংশ এসব তো হিন্দু মন্দিরে থাকে!

'বন্দে মাতরম' রচনার ১৫০ বছর উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনায় লোকসভায় ভাষণ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনায় রাজ্যসভায় ভাষণ দিচ্ছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ।

২৩তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে পাশাপাশি দুই বিশ্ব নেতা। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

নয়াদিল্লিতে ভারত-রাশিয়া বাণিজ্য সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

ভারতের হ্যান্ডলুম ও বস্ত্র রপ্তানি বিশ্বজুড়ে স্বীকৃতি অর্জন করছে

এপ্রিল - সেপ্টেম্বর

২০২৫

-এর মোট বস্ত্র রপ্তানি

১১১টি দেশে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি

সূত্র - মিডিয়া রিপোর্ট

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং অঙ্কিত প্রিন্টিং হাউস, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।